POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ
أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ۙ
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء:59)

নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ উহাদের প্রাপককে অর্পণ কর, এবং যখন তোমরা যখন লোকের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার কর।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

সংখ্যা 38

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

17 সেপ্টেম্বর, 2020 ● 28 মহররম 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

তাহরীমার তাকবীর পাঠের পর আঁ হযরত (সা.) এই দোয়া পড়তেন

●হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) তকবীর এবং সূরা পাঠের মাঝে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'হে রসুলুল্লাহ! আমার পিতামাতা (আপনার প্রতি) উৎসর্গিত হোক। তকবীর এবং সূরা পাঠের মাঝে আপনি যে সময়টুকু নীরব থাকেন, সেই সময় আপনি কোন দোয়া পাঠ করেন? রসুলুল্লাহ্ (সা.) উত্তর দিলেন, আমি এই দোয়া করি-

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ
كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ
نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ
مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ
وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

(হে আল্লাহ্ আমার এবং আমার ভুলত্রুটির মাঝে এতটা তফাৎ গড়ে দাও, যতটা তফাৎ তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে সৃষ্টি করেছ। হে আল্লাহ্ আমাকে ভুলত্রুটি থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দাও, যেভাবে শুভ্রবস্ত্র ধুয়ে পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ্ আমার ভুলত্রুটিসমূহ পানি, বরফ এবং শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত কর।)

●হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.), হযরত আবু বাকার এবং হযরত উমর (রা.) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দিয়ে নামায শুরু করতেন। (অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করতেন)

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আযান,

এই সংখ্যায়

শান্তির পথ (হুযুরের ভাষণ)

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৪ জুলাই, ২০২০ (পূর্ণাঙ্গ)

হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃতান্ত

খোদা তা'লা আমাকে 'মামুর' (প্রত্যাদিষ্ট) এবং প্রতিশ্রুত মসীহ নামে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। কাজেই যারা আমার বিরোধীতা করে, তারা আমার নয় বরং খোদার তা'লার বিরোধীতা করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্টদের বিরোধীতা করায় ঈমান ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে।

আমার বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থা এমন যেখানে তাদের ঈমান হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। কেননা, তারা পুণ্যবানদেরকে অসৎ আর আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করে। এর ফলে খোদার সঙ্গে তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আর একথা স্পষ্ট যে, খোদা তা'লা আমাকে 'মামুর' (প্রত্যাদিষ্ট) এবং প্রতিশ্রুত মসীহ নামে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। কাজেই যারা আমার বিরোধীতা করে, তারা আমার নয় বরং খোদার তা'লার বিরোধীতা করে। কেননা যতদিন আমি দাবি করি নি, তাদের মধ্যে আমাকে অনেকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত আর আমার হাত থেকে পানির পাত্র নিয়ে ওজু করাকে পুণ্যলাভ ও গর্বের কারণ বলে মনে করত। অনেকে এমনও ছিল যারা আমার বয়আত করার জন্য পীড়াপীড়ি করত, কিন্তু যখন খোদার নামে এবং তাঁরই আদেশে এই জামাতের গোড়াপত্তন করা হল, তখন এরাই বিরোধীতায় নেমে পড়ল। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে এদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না, খোদার সঙ্গেই ছিল। যদি খোদা তা'লার সঙ্গে তাদের সত্যিকার সম্পর্ক থাকত, তবে ধার্মিকতা, তাকওয়া এবং খোদাভীতির দাবি ছিল, তারা সর্বপ্রথম আমার এই ঘোষণায় সাড়া দিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন মূলক সিজদা করত এবং আমাকে সাদর অভিবাদন জানাত, কিন্তু না- তারা নিজেদের অস্ত্র নিয়ে এমনভাবে বিরোধীতায় উঠেপড়ে লাগল যে, আমাকে কাফের, ধর্মত্যাগী ও দাজ্জাল নামে আখ্যায়িত করল। পরিতাপ তাদের জন্য! এই নির্বোধের দল বুঝে উঠতে পারল না যে, যে ব্যক্তি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اور اَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيْدِيْ وَتَفْرِيْدِيْ ধ্বনি শ্রবণ করে, সে কি তাদের এমন কদর্য ভাষা ও গালাগালির পরোয়া করবে? দুঃখের বিষয় এই যে, এই নির্বোধরা এতটুকুও জানল না যে কুফর এবং ঈমানের সম্পর্ক ইহকালের সঙ্গে নয়, বরং খোদার সঙ্গে আর খোদা তা'লা আমার মোমেন এবং প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সত্যায়ন করেছেন। তবে আমি তাদের এমন অনর্থক আচরণের পরোয়া করব কেন? মোটকথা, এই বিষয়গুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এরা আমার বিরোধী ছিল না, বরং এরা খোদা তা'লার বাণীর বিরোধীতা করেছে। এই কারণেই আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্টদের বিরোধীতা করায় ঈমান ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। একথা স্পষ্ট যে আমার বিরোধীরা প্রকৃত প্রস্তাবে খোদার বিরোধীতা করছে। আমি যদি আলোর পানে অগ্রসর হই, নিশ্চিতভাবেই আলোর পানেই অগ্রসর হচ্ছি, কেননা আমার সমর্থনে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বৃষ্টিধারার ন্যায় অসংখ্য নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, তবে এটিও নিশ্চিত যে আমার বিরুদ্ধবাদীরা অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে। আলো রুহুল কুদুসকে নিয়ে আসে আর অন্ধকার শয়তানের সঙ্গে নৈকট্য তৈরী করে। আর এভাবে 'ওলী'র বিরোধীতা মানুষকে ঈমান শূন্য বানিয়ে দেয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭৫)

মসজিদকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আখড়া বা বিবাদ-বিশৃঙ্খলা তৈরীর স্থানে পরিণত করা ভয়ানক অপরাধ, যার অনুমতি ইসলাম কোনওভাবেই দেয় না

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

সূরা বাকারার ১১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

যেহেতু এরা আমাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিতে চায়, তাই আমরাও তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিব। আর এরা ইহকালেও লাঞ্ছিত হবে এবং পরকালেও তারা মহা শাস্তিভোগ করবে। কেননা জান্নাত হল খোদা তা'লার ঘর যার প্রতিরূপ হল মসজিদ। যখন এর মসজিদকে ধ্বংস করল, তবে পরকালে তারা কিভাবে শান্তি পেতে পারে? কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে ইসলামী শরিয়ত বিধান শ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করেছে। আল্লাহ্ তা'লা সূরা তওবার ১৩ নং রুকুতে এমন কিছু মানষের উল্লেখ করেছেন যারা তৎকালীন প্রশাসন অর্থাৎ রসূল করীম (সা.) এবং তাঁর জামাতের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ তৈরী করেছিল এবং তারা নিজেরাই রসুলুল্লাহ (সা.)এর নিকট আদেবন

শেষাংশ ১০ পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

শান্তির পথ

জাতি সমূহের মাঝে সু-সম্পর্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে প্রদত্ত হুযুর আনোয়ারের ঐতিহাসিক ভাষণ

২৭ শে জুন,২০১২

অসীম দয়ালূ ও পরম দয়াময় আল্লাহর নামে।

আপনাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক।

আপনারা সময় বের করে আমার বক্তব্য শুনতে এসেছেন– তাই প্রথমেই আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাকে এমন একটি বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে যা অত্যন্ত ব্যাপক। এর বহুবিধ দিক রয়েছে। তাই আমার পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বিষয়টির খুঁটিনাটি তুলে ধরা সম্ভব নয়। আর যে বিষয়ে আমাকে বলতে বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়'। আজকের পৃথিবীর জন্য নিঃসন্দেহে এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য একটি বিষয়। সময়ের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি "জাতিসমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পারস্পরিক সুসম্পর্ক রচনায় ইসলামী শিক্ষা"-এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য তুলে ধরবো। প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্জিত হতে পারে না। আর এই নীতিটি জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করেন। নৈরাজ্য সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর কিছু মানুষ ছাড়া কেউ একথা দাবী করে বলতে পারে না, অমুক সমাজে বা দেশে অথবা গোটা পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করছে। এতদসত্ত্বেও, আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির রাজত্ব বিরাজ করতে দেখছি। বিভিন্ন দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এমন নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সব সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে তাদের নীতি নির্ধারণের দাবী থাকা সত্ত্বেও এই বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ বিদ্যমান। অথচ সবাই দাবী করে বলে, শান্তি প্রতিষ্ঠাই হলো তাদের মূল লক্ষ্য! কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিতে, বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে আর এর ফলে যে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ছে– এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়, এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। তাই যেখানে বা যখনই বৈষম্য চোখে পড়ে তা দূর করা এবং এ উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করা একান্ত অপরিহার্য।

আর তাই নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়ামুসলিম জামা'তের প্রধান হিসেবে, ন্যায়ের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা ও শান্তি অর্জনের উপায় সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পূর্ণভাবে একটি ধর্মীয় সংগঠন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো, যে মসীহ্ এবং সংস্কারকের এ যুগে আবির্ভাবের ও বিশ্বকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত করার কথা ছিল, তিনি সত্যিই এসে গেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও সংস্কারক। আর এ কারণে আমরা তাঁকেগ্রহণ করেছি। আমরা তাঁর শিক্ষার আলোকে পবিত্র কুরআনের অনুশাসনমেনে চলি আর ইসলামের সেই প্রকৃত ওখাঁটি শিক্ষার প্রচার করি যার ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআন। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে আমি যা বলবো তা হবে কুরআনের শিক্ষার আলোকে।বিশ্বে শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে আপনারা সকলে নিয়মিতভাবে অভিমত ব্যক্ত করেথাকেন এবং নিঃসন্দেহে অনেকউদ্যোগও নেন। আপনাদের সৃজনশীলও বুদ্ধিদীপ্ত মন-মানসিকতা আপনাদেরকে মহৎ ধ্যান-ধারণা,পরিকল্পনা এবং শান্তি স্থাপনের বিভিন্নরূপরেখা উপস্থাপনে সহায়তা করে। তাই এ বিষয়ে জাগতিক বা রাজনৈতিক আঙ্গিকে আমার বলার প্রয়োজন নেই,বরং ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তা-ই হবে আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। আর আগেই বলেছি, এ উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক-নির্দেশিকা উপস্থাপন করবো। আর এই নীতিটি জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করেন। নৈরাজ্য সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর কিছু মানুষ ছাড়াকেউ একথা দাবী করে বলতে পারে না,অমুক সমাজে বা দেশে অথবা গোটা পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিতহওয়া সত্ত্বেও সেখানে অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করছে।

এতদসত্ত্বেও, আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির রাজত বিরাজ করতে দেখছি। বিভিন্ন দেশেরভেতরে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কেরক্ষেত্রেও এমন নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সব সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে তাদের নীতি নির্ধারণের দাবী থাকা সত্ত্বেও এই বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ বিদ্যমান। অথচ সবাই দাবী করে বলে, শান্তি প্রতিষ্ঠাই হলো তাদের মূললক্ষ্য! কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিতে, বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছেআর এর ফলে যে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ছে– এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়, এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। তাই যেখানে বা যখনই বৈষম্য চোখে পড়ে তা দূর করা এবং এ উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যসকল চেষ্টা করা একান্ত অপরিহার্য।

আর তাই নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হিসেবে, ন্যায়ের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা ও শান্তি অর্জনের উপায় সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পূর্ণভাবেএকটি ধর্মীয় সংগঠন। আমাদের একথা সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক,মানবীয় জ্ঞান ও মেধ ত্রুটিমুক্ত নয়,বরং এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা চিন্তা-ভাবনার রূপরেখা নির্ধারণের সময়, প্রায়শই নির্দিষ্ট কিছু বিষয় মানব হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে বিচার ক্ষমতাকে কলুষিত করে দিতে পারে এবং এর পরিণতিতে মানুষ তার ব্যক্তি-স্বার্থচরিতার্থ করার কাজে লিপ্তও হতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি অন্যায় ফলাফল নির্ধারণ ও অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইন নিখুঁত; হীন স্বার্থ সিদ্ধি বা অন্যায্য কোন উপকরণই এতে থাকেনা। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির জন্য কেবল মঙ্গলই কামনা করেথাকেন আর তাই তাঁর আইন হলো সম্পূর্ণভাবে ন্যায্য। পৃথিবীর মানুষ যেদিন এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, সেদিন প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তির ভিত রচিত হবে। অন্যথায়, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস জাগতিক প্রচেষ্টা পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কোন কার্যকর ফলাফল বয়ে আনতে পারছে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে,কয়েকটি দেশের নেতারা ভবিষ্যতে বিশ্বের সকল জাতির মাঝে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে 'লীগ অব্ নেশন্‌স্' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল, বিশ্বজুড়ে শান্তি বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধ প্রতিহত করা। দুঃখজনকভাবে, এর সংবিধান ও প্রস্তাবাবলীতে এমন কিছু ত্রুটি এবং দুর্বলতা ছিল যা সমভাবে সকল মানুষ ও সকল জাতির অধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেই অনেক দেশ একের পর এক 'লীগ' থেকে সরে পড়তে আরম্ভ করে। এতে বিরাজমান সেই অসাম্যের কারণে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি অর্জন সম্ভব হয় নি। 'লীগের' প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এটা পৃথিবীকে সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়। আমরা সবাই এইবিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে অবহিত। এতে বিশ্বজুড়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, যাদের অনেকেই ছিলবেসামরিক নিরীহ জনসাধারণ।এই যুদ্ধ বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত হওয়া উচিত ছিল।এটি ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সকল পক্ষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করে এমন বিচক্ষণ নীতি-নির্ধারণের উপলক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল যা বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠার একটি উপকরণ সাব্যস্ত হতে পারতো। তৎকালীন বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উদ্যোগ নেয় আর এভাবে 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু অচিরেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায়,যে মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশে জাতিসংঘের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল তাআজও অর্জিত হয় নি। ইদানিং কয়েকটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রদত্তঅকপট বিবৃতি নিঃসন্দেহে এর ব্যর্থতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে। প্রশ্ন হলো, ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনকল্পে আর শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলামের ভাষ্য কি? পবিত্র কুরআনের ৪৯ নম্বর সূরার১৪ নম্বর আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন,মানুষে মানুষে জাতিগত ভিন্নতা বা কৃষ্টিগত পার্থক্য আমাদের পরিচিতির একটি মাধ্যম মাত্র, কিন্তু এটি কারও উপর অন্য কারও শ্রেষ্ঠত্ব কোনভাবেই সাব্যস্ত বা প্রদান করে না। কুরআন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, সকল মানুষ জন্মগতভাবে সমান। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শেষ ভাষণে সকল মুসলমানকে চিরকাল একথা স্মরণ রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,একজন আরববাসী একজন অনারবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়, আবার একজন অনারবও একজন আরবের উপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। তিনি আরও বলেছেন, একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ একজন কৃষ্ণাঙ্গের তুলনায় কোন প্রকারশ্রেষ্ঠত্ব রাখে না এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিও একজন শ্বেতাঙ্গের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়। অতএব সকল জাতি ও সকলবর্ণের মানুষ সমান– এটিই ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা। আর একথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সকল মানুষকে বৈষম্য ও পক্ষপাতমুক্তভাবে সম-অধিকার প্রদান করা উচিত। এটিই হচ্ছে বিভিন্ন দল ও জাতির মাঝে সম্প্রীতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল পন্থা ও অপরিহার্য সূত্র। কিন্তু আজ আমরা শক্তিশালী এবং দুর্বলজাতিসমূহের মাঝে পারস্পরিক বিভেদও বৈষম্য দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ,জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশের মাঝে আমর াবৈষম্য লক্ষ্য করি। অনুরূপভাবে, নিরাপত্তা পরিষদে কিছু 'স্থায়ী' সদস্যআছে আবার কিছু আছে 'অস্থায়ী'। এই বিভাজন উদ্বেগ ও হতাশার আভ্যন্তরীণ একটি কারণ হিসেবে প্রমাণিত আর এজন্য আমরা প্রায়শই কয়েকটি দেশকে এই অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর দেখতে পাই।

ইসলাম ধর্ম সকল ক্ষেত্রে নিখাদ ন্যায় প্রতিষ্ঠার ও সাম্যের শিক্ষা দেয়। আমরা পবিত্র কুরআনের ৫ নম্বর সূরার ৩ নম্বর আয়াতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেখতে পাই। এই আয়াতে বলা হয়েছে, ন্যায়ের দাবী সমুন্নত রাখতে হলে এমন লোকদের সাথেও ন্যায্য ও সাম্যের আচরণ করা আবশ্যক যারা ঘৃণা ও শত্রুতা প্রদর্শনে সকল সীমা অতিম করে। আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, যেখানে যে-ইতোমাদেরকে কল্যাণ ও পুণ্যের দিকে আহ্বান করে তোমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। আর যে-ই যেক্ষেত্রে পাপ ও অন্যায় করতে তোমাদের পরামর্শ দেয়,তোমাদের তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন

এরপর ১০ পাতায়....

জুমআর খুতবা

হযরত সা'দ (রা.) সেই ব্যক্তি যিনি বদরের যুদ্ধের সময় যুবক ছিলেন। পরবর্তীতে তার হাতে ইরান বিজিত হয়। তিনি কূফার প্রতিষ্ঠাতা এবং ইরাকের গভর্ণর ছিলেন। কিন্তু তার দৃষ্টিতে এই সমস্ত সম্মান ও গৌরব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সম্মান ও গৌরবের মোকাবিলায় মূল্যহীন ছিল।

আঁ হযরত (সা) এর মর্যাদাবান বদরী সাহাবী হযরত সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর স্মৃতিচারণা, যিনি ছিলেন ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে ঈমান আনয়নকারী ,মক্কায় বসবাসকালে কষ্টসহনকারী নবী করীম (সা.)-এর নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্তির সৌভাগ্য অর্জনকারী, ইসলাম এবং খিলাফতের প্রতি আত্মাভিমান পোষণকারী, ফারিসুল ইসলাম এবং ইরাক বিজেতা অধিনায়ক।

চারজন মরহুমীনের প্রশংসা সূচক গুণাবলীর উল্লেখ, যারা হলেন মাননীয় সফদর আলি গুজ্জর সাহেব (প্রখ্যাত পাঞ্জাবি নযম রচয়িতা, আল ফযল ইন্টারন্যাশন্যাল ও আখবার আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের সদস্য), প্রফেসর নাসীর আহমদ খান মরহুম সাহেবের স্ত্রী মাননীয়া ইফাত নাসীর সাহেবা, মাননীয় আব্দুর রহীম সাকি সাহেব (যুক্তরাজ্যের সাধারণ সচিবালয়ের কর্মী) এবং মাননীয় সঈদ আহমদ সেহগাল সাহেব (প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে ডাকবিভাগের স্বেচ্ছাসেবী)। হুযুর আনোয়ার মরহুমীনদের জানাযা গায়েব পড়ান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ১৪ই আগস্ট , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (১৪ যহুর, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত দু' সপ্তাহ পূর্বের জুমুআয় সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, আজও তার সম্পর্কেই কিছু কথা বলব। যুদ্ধের কথা হচ্ছিল, যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ (রা.)-এর স্ত্রী হযরত সালমা বিনতে হাফসা (রা.) দেখেন, শিকলাবদ্ধ একজন বন্দি অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণে আকাঙ্ক্ষী ছিল, তার নাম ছিল আবু মেহজান সাক্ফী। হযরত উমর (রা.) তাকে মদ পানের অপরাধে দেশান্তরের শাস্তি দিয়েছিলেন। সে এখানে আসে আর এখানে আসার পর সে পুনরায় মদ পান করে, যে কারণে হযরত সা'দ (রা.) তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন এবং (পায়ে) শিকল পরিয়ে দেন। আবু মেহজান হযরত সা'দ (রা.)-এর ক্রীতদাসী যাহরা-কে অনুরোধ করে যে, আমার শিকল খুলে দাও যাতে আমি যুদ্ধে যোগ দিতে পারি। সে আরো বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে ফিরে এসে নিজেই শিকল পরে নিব। দাসী তার কথা মেনে নেয় এবং শিকল খুলে দেয়। আবু মেহজান হযরত সা'দ (রা.)-এর ঘোড়ায় আরোহন করে যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করে এবং শত্রু সারিতে ঢুকে পড়ে আর সোজা গিয়ে বড় শ্বেত হস্তির ওপর হামলা করে। হযরত সা'দ (রা.) এসবই প্রত্যক্ষ করছিলেন, তিনি বলেন, ঘোড়াটি তো আমার, কিন্তু এর ওপর আরোহী আবু মেহজান সাক্ফী মনে হচ্ছে। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল, অসুস্থতার কারণে হযরত সা'দ (রা.) সরাসরি এই যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি (কিন্তু) দূর থেকে তত্ত্বাবধান করছিলেন। যাহোক, তিনদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে, যুদ্ধ শেষ হলে আবু মেহজান সাকফী ফিরে এসে নিজের শিকল পরে নেয়। হযরত সা'দ (রা.) আবু মেহজানকে একথা বলে মুক্ত করে দেন যে, তুমি যদি ভবিষ্যতে আবার মদ পান কর তাহলে আমি তোমাকে কঠোর শাস্তি দিব। আবু মেহজান অঙ্গীকার করে যে, ভবিষ্যতে কখনো মদ পান করবে না। অপর এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'দ (রা.) এই ঘটনা হযরত উমর (রা.)-কে লিখলে তিনি বলেন, সে যদি ভবিষ্যতে মদ পান করা থেকে তওবা করে তাহলে তাকে শাস্তি দিও না। এ কারণে আবু মেহজান ভবিষ্যতে আর মদ পান না করার কসম খায় এবং হযরত সা'দ (রা.) তাকে মুক্ত করে দেন।

(বশীর সাজিদ রচিত আশারায়ে মুবাশ্বেরা, পৃ: ৮৫০-৮৫১)

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্বে বলা হয়েছিল, দাসী তাকে ছেড়ে দেয়, কিন্তু তিনি (রা.) এভাবে লিখেছেন যে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) মহানবী (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবীদের একজন ছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাকে নিজ খিলাফতকালে ইরানী বাহিনীর মোকাবিলায় ইসলামী বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত করেছিলেন। দৈবক্রমে তার উরুতে একটি ফোঁড়া বের হয় যাকে বাগি বলা হয়, তা দীর্ঘদিন ভোগাতে থাকে। বহু চিকিৎসা করিয়েও কোন লাভ হয়নি। অবশেষে তিনি ভাবলেন, আমি যদি বিছানায় পড়ে থাকি আর সৈনিকরা দেখে যে, আমি সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে নেই, তাহলে তারা মনোবল হারিয়ে বসবে। কাজেই, তিনি একটি গাছের ওপর মাচা প্রস্তুত করান, যেমনটি আমাদের এখানে মানুষ বাগান পাহারা দেওয়ার জন্য বানিয়ে থাকে। তিনি লোকদের সাহায্যে নিয়ে সেই মাচায় চড়ে বসতেন যাতে মুসলমান বাহিনী তাকে দেখতে পায় আর তারা আশ্বস্ত হয় যে, তাদের কমাণ্ডার সাথেই আছেন। সে দিনগুলোতেই তিনি (রা.) সংবাদ পান যে, একজন আরব নেতা মদ পান করেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, যদিও ইসলামে মদ হারাম ছিল কিন্তু আরবরা এতে গভীরভাবে আসক্ত ছিল; আর একবার নেশায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা ছাড়াতে অনেক কষ্ট হয়। সেই নেতারও ইসলাম গ্রহণের পর মাত্র দু'তিন বছরই অতিবাহিত হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, কারো যদি নেশার পুরোনো অভ্যাস থাকে তাহলে দু'তিন বছরে সেই বদভ্যাস দূর হয় না। যাহোক হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) যখন এই মুসলিম আরব নেতার মদ পান সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনি তাকে বন্দি করেন। সেসময় রীতিমতো জেলখানা ছিল না, কাউকে বন্দি বানাতে হলে তাকে কোন কক্ষে আটকে রাখা হতো এবং দরজায় পাহারাদার নিযুক্ত করা হতো। সুতরাং, এই মুসলিম আরব নেতাকেও একটি কক্ষে বন্দি করে দরজায় পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়। এরপর তিনি লিখেন, এই যুদ্ধ যখন সংঘটিত হচ্ছিল সে বছরটিকে ইসলামের ইতিহাসে বিপদের বছর বলে আখ্যায়িত করা হয়, কেননা এই যুদ্ধে মুসলমানদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এক জায়গায় ইসলামী সেনাবাহিনীর ঘোড়াগুলো শত্রুদের হাতি দেখে পলায়ন করে; এর পাশেই একটি ছোট নদী ছিল, ঘোড়াগুলো সেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আরবরা যেহেতু সাঁতার কাটতে জানত না, তাই শত শত মুসলমান পানিতে ডুবে মারা যায়। এজন্য এ বছরটিকে বিপদের বা সংকটের বছর বলা হয়। যাহোক, সেই মুসলিম আরব নেতা এক কক্ষে বন্দি ছিল, মুসলমান সৈনিকরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সেই কক্ষের নিকটে বসে আলোচনা করত যে, এ যুদ্ধে মুসলমানদের খুবই ক্ষতি হয়েছে। সে তখন মর্মপীড়ায় ভুগতো আর আক্ষেপ করত যে, এমন সময়ে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে নি। নিঃসন্দেহে তার মাঝে এই দুর্বলতা ছিল যে, সে মদ পান করেছে, কিন্তু সে বড়ই সাহসী মানুষ ছিল আর তার মাঝে এক উদ্দীপনা ছিল। যুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা শুনে কক্ষের ভেতরে সে এমনভাবে পায়চারি করতো যেভাবে খাঁচার বাঘ পায়চারী করে

বেড়ায়। পায়চারী করা অবস্থায় সে যে পঙক্তি আওড়াতো তার অর্থ হলো, আজই ইসলামকে রক্ষা করার এবং নিজ বীরত্বের স্বাক্ষর রাখার সুবর্ণ সুযোগ তোমার ছিল, কিন্তু তুমি কারারুদ্ধ। হযরত সা'দ (রা.)-এর স্ত্রী খুবই সাহসী মহিলা ছিলেন। একদিন তিনি সেই কক্ষের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই পঙক্তি শুনতে পান। তিনি দেখেন যে, দরজায় পাহারাদার নেই। তিনি দরজার কাছে গিয়ে সেই বন্দিকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি জান যে, সা'দ তোমাকে বন্দি করে রেখেছে। তিনি যদি জানতে পারেন যে, আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি তাহলে তিনি আমাকে ছাড়বেন না। কিন্তু আমার মন তোমাকে মুক্ত করে দিতে চায় যেন তুমি নিজের বাসনানুযায়ী ইসলামের কাজে আসতে পার। সে বলে, যুদ্ধের সময় আপনি আমাকে মুক্ত করে দিন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যুদ্ধ শেষে দ্রুত ফিরে এসে এই কক্ষে ঢুকে পড়ব। উক্ত মহিলার হৃদয়েও ইসলামের জন্য মর্মব্যথা ছিল এবং ইসলামের সুরক্ষার জন্য এক বিশেষ উদ্দীপনা ছিল। তাই তিনি উক্ত ব্যক্তিকে বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে দেন। অতঃপর সে যুদ্ধে যোগদান করে আর এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যে, তার এই বীরত্বের কারণে ইসলামী সেনাবাহিনী পিছপা হওয়ার পরিবর্তে সামনে অগ্রসর হয়। সা'দ (রা.) তাকে চিনে ফেলেন এবং পরবর্তীতে বলেন, আজকের যুদ্ধে সেই ব্যক্তি ছিল যাকে আমি মদ পানের অপরাধে বন্দি করে রেখেছিলাম। সে যদিও চেহারায় নেকাব পরে রেখেছিল কিন্তু আমি তার আক্রমণের ধরণ ও তার উচ্চতা জানি। যে ব্যক্তি একে মুক্ত করেছে আমি তাকে খুঁজে বের করব এবং কঠোর শাস্তি দিব। অর্থাৎ, যে এই ব্যক্তিকে বন্দিশালা থেকে মুক্ত করেছে, এর শৃঙ্খল খুলে দিয়েছে, তাকে কঠোর শাস্তি দিব। হযরত সা'দ (রা.) যখন একথা বলেন তখন তার স্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তোমার কি লজ্জা হয় না? নিজে গাছে মাচা বানিয়ে বসে আছ আর এমন ব্যক্তিকে বন্দি করে রেখেছ যে কিনা নিঃশঙ্কচিত্তে শত্রুবুহ্য ভেদ করে ঢুকে পড়ে আর নিজ প্রাণেরও কোন পরোয়া করে না। সেই বক্তিকে বন্দিদশা থেকে আমি মুক্ত করেছি, তোমার যা ইচ্ছে কর। আমিই তাকে মুক্ত করেছিলাম, এখন তোমার যা ইচ্ছা করতে পার। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিবরণ লাজনাদের উদ্দেশ্যে তাঁর এক বক্তৃতায় তুলে ধরেছিলেন আর বলেছিলেন, নারীরা ইসলামের জন্য অনেক বড় বড় কাজ করেছে। তিনি বলেন, অতএব, আজও আহমদী নারীদের এসব দৃষ্টান্তকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

(আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৫, পৃ: ৪২৮-৪৩০)

অতঃপর তিনি হযরত যায়েদ (রা.)-এর বরাতেই নারীদের ত্যাগ-তিতিক্ষার আরো ঘটনা শুনান।

আনসারদের বনু সুলায়েম গোত্রের বিখ্যাত মহিলা কবি ও মহিলা সাহাবী হযরত খানসা (রা.) এ যুদ্ধে তার ৪ পুত্রকে আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করেন। হযরত খানসা (রা.)-এর স্বামী এবং ভাই তার যৌবনকালেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি (রা.) খুব কষ্ট করে তার সন্তানদের লালন পালন করেছিলেন। কাদসিয়া যুদ্ধের শেষ দিন প্রভাতে যুদ্ধের পূর্বে হযরত খানসা (রা.) তার পুত্রদের সম্বধোন করে বলেন, হে আমার পুত্ররা! তোমরা নিজ ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং স্বেচ্ছায় হিজরত করেছ। সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই,আমি তোমাদের বংশকে কখনো লজ্জিত হতে দিই নি। স্মরণ রেখো! পারলৌকিক জীবন এই নশ্বর জীবন অপেক্ষা অনেক উত্তম। হে আমার পুত্ররা! দৃঢ়চিত্ত ও অবিচল থেকো আর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ কোরো। খোদার তাকওয়া অবলম্বন কর। যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় আর অশ্বারোহীরা বুক ফুলিয়ে যুদ্ধ করে, তখন তোমরা নিজেদের পরকালকে সুনিশ্চিত করার জন্য তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ো। হযরত খানসা (রা.)-এর পুত্ররা তার নির্দেশ পালন করে নিজেদের ঘোড়ার লাগাম ধরে রণ-সংগীত গাইতে গাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করে। সেদিন সন্ধ্যা নামার পূর্বেই কাদসিয়ার বুকে ইসলামী পতাকা উড়তে থাকে। হযরত খানসা (রা.)-কে যখন বলা হয়, আপনার চার পুত্রই শহীদ হয়েছে তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ যে, তিনি তাদেরকে শাহাদাতের সম্মানে ভূষিত করেছেন। এটি আমার জন্য কম গর্বের বিষয় নয় যে, তারা সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আমাদেরকে স্বীয় রহমতের ছায়ায় একত্রিত রাখবেন।

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

কাদসিয়া বিজয়ের পর ইসলামী বাহিনী বেবিলন বিজয় করে। বেবিলন ছিল বর্তমান ইরাকের প্রাচীন শহর। পবিত্র কুরআনেও হারুত ও মারুতের বরাতে এর উল্লেখ হয়েছে। এটি সেখানেই ছিল যেখানে বর্তমান কূফা অবস্থিত। শহর পরিচিতি (পুস্তকে) এর এই পরিচিতিই লিখা রয়েছে। অতঃপর তিনি (রা.) আরো লিখেন, এটি জয় করার পর (ইসলামী সেনাদল) কুসা নামক ঐতিহাসিক শহরে পৌঁছে। এটি হলো সেই স্থান যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে নমরুদ (বাদশাহ্) বন্দি করেছিল। তখনও সেই বন্দিশালা বিদ্যমান ছিল। হযরত সা'দ (রা.) সেখানে পৌঁছনোর পর সেই বন্দিশালা দেখে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পাঠ করেন– 'তিলকাল আইয়ামু নুদাবিলুহা বাইনান নাস' (সূরা আলে ইমরান: ১৪১) অর্থাৎ এ দিনগুলো এমন যে, আমরা সেগুলো মানুষের মাঝে আবর্তিত করে থাকি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

কুসা থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে তারা 'বাহরাসীর' নামক এক স্থানে পৌঁছেন। মু'জেমুল বুলদান অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের শহর পরিচিতি পুস্তকে এর নাম 'বাহোরে সীর' উল্লেখ রয়েছে। 'বাহোরে সীর' দজলা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত ইরাকের শহর মিদিয়ান-এর কাছে বাগদাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর একটি স্থানের নাম। এখানে কিসরার বাদশাহ্‌র শিকারী বাঘ থাকত। হযরত সা'দ (রা.)-এর সেনাদল এর কাছাকাছি পৌঁছলে তারা সেই হিংস্র জন্তুকে এই সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণের জন্য ছেড়ে দেয় আর বাঘ গর্জে উঠে সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। হযরত সা'দ (রা.)-এর ভাই হযরত হাসেম বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) সেনাদলের অগ্রসারির কমাণ্ডার ছিলেন। তিনি সেই বাঘের ওপর তরবারি দিয়ে এমনভাবে আঘত করেন যে, বাঘ সেখানেই কুপোকাত হয়ে যায়।

এরপর এই একই যুদ্ধাভিযানে মিদিয়ানের যুদ্ধও রয়েছে। মিদিয়ান কিসরার রাজধানী ছিল। এখানে তাদের শুভ্র প্রাসাদগুলো বিদ্যমান ছিল। মুসলমান ও মিদিয়ানের মাঝে দজলা নদী প্রতিবন্ধক ছিল। ইরানীরা নদীর ওপর থাকা সব পুল ভেঙে ফেলে। হযরত সা'দ (রা.) সেনাদলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মুসলমানরা! শত্রুরা নদীর আশ্রয় গ্রহণ করেছে, চল! আমরা এটি সাঁতরে পার হই। একথা বলেই তিনি অর্থাৎ হযরত সাদ (রা.)তার ঘোড়া নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন আর সৈন্যরা তাদের অধিনায়কের অনুসরণে তাদের ঘোড়া নিয়ে নদীতে নেমে পড়ে। এভাবে ইসলামী সেনাদল নদী পার হয়ে যায়। ইরানীরা বিস্ময়কর এই দৃশ্য দেখে ভীতত্রস্ত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করে যে দৈত্য এসেছে, দানব এসে গেছে বলতে বলতে পলায়ন করে। মুসলমানরা সম্মুখে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে শহর ও কিসরার প্রাসাদগুলো দখল করে নেয় আর এভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় যা তিনি (সা.) পরিখার যুদ্ধের সময় পরিখা খননকালে পাথরে কোদাল দিয়ে আঘাত হানার সময় বলেছিলেন যে, আমাকে মিদিয়ানের শুভ্র প্রাসাদগুলো পতনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। সেই প্রাসাদগুলো জনমানবহীন অবস্থায় দেখে হযরত সা'দ (রা.) সূরা দুখানের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۙ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ

(সূরা দুখান: ২৬-২৯) অর্থাৎ, কতই না বাগান ও ঝর্ণা (তারা) পশ্চাতে ছেড়ে গেছে, এবং শস্যক্ষেত ও সুন্দর-মনোরম আবাসস্থল, আর নেয়ামত, যাতে তারা পরম সুখ ও আনন্দে বসবাস করত। এমনই (হয়েছিল) এবং আমরা অন্য এক জাতিকে সেসবের উত্তরাধিকারী করে দিলাম।

(সূরা দুখান: ২৬-২৯)

যাহোক, এরপর হযরত সা'দ (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে পত্র মারফত আরো অগ্রসর হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রত্যুত্তরে হযরত উমর (রা.) জানান যে, আপাতত অগ্রাভিযানের সেখানেই ইতি টানুন এবং বিজিত এলাকার আইনশৃঙ্খলার প্রতি মনোযোগী হোন। তদনুযায়ী হযরত সা'দ (রা.) মিদিয়ানকে কেন্দ্র বা রাজধানী বানিয়ে আইন-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল করতে সচেষ্ট হন এবং তা সুচারুরূপে সম্পাদন করতে সক্ষমও হন। তিনি ইরাক অঞ্চলের আদমশুমারি করান ও পুরো অঞ্চল পরিমাপ করান আর প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করেন এবং নিজের সুপরিকল্পনা ও উত্তম কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে রণকৌশলে

পারদর্শিতার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার যোগ্যতাও দান করেছেন। মানুষের ধারণা হলো, মুসলমানরা যখন কোন অঞ্চল জয় করেছে তখন হয়ত প্রজাদের প্রতি দেখাশুনা করেনি। অথচ (প্রকৃত চিত্র হলো) মুসলমানরা যখনই কোন শহর জয় করেছে, স্থানীয়দের পূর্বের তুলনায় অধিক যত্ন নিয়েছে।

এরপর রয়েছে কূফা নির্মাণের বিষয়টি। মিদিয়ানের আবহাওয়া আরবের স্বাস্থ্যসম্মত ছিল না। তাই হযরত সা'দ (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর অনুমতি নিয়ে এক নতুন শহর গড়ে তোলেন, যেখানে বিভিন্ন আরব গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করান, যেখানে একযোগে চল্লিশ হাজার মুসুল্লী নামায আদায় করতে পারতো। কূফা ছিল মূলত সেনানিবাস– যেখানে এক লক্ষ সৈনিক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত সা'দ এক দীর্ঘকাল মিদিয়ানে অবস্থানের পর অনুভব করেন যে, এখানকার আবহাওয়া আরবদের রং-রূপ একেবারে বদলে দিয়েছে। হযরত উমর (রা.)-কে এ বিষয়ে জানানো হলে তাঁর পক্ষ থেকে আদেশ আসে যে, আরব সীমান্তে কোন যথোপযুক্ত এলাকা সন্ধান করে এক নতুন শহর আবাদ করুন এবং সেখানে আরবদেরকে আবাদ করে সেটিকেই কেন্দ্র বা রাজধানী ঘোষণা দিন। হযরত সা'দ উক্ত আদেশ অনুযায়ী মিদিয়ান থেকে বের হয়ে একটি অতি উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে কূফা নামে এক বৃহৎ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি আরবের ভিন্ন ভিন্ন গোত্রগুলোর পৃথক পৃথক পাড়ায় আবাসনের ব্যবস্থা করেন। শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে বিশাল মসজিদ নির্মাণ করান, যেখানে প্রায় চল্লিশ হাজার নামাযীর সংকুলান হতো। মসজিদের সন্নিকটেই বায়তুল মালের ভবন এবং নিজের বসবাসের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করান– যেটি কাসরে সা'দ তথা সা'দের প্রাসাদ বলে প্রসিদ্ধ ছিল।

(রওশন সিতারে, পৃ: ৮৪-৮৮) (আস সীরুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১৭-১১৮) (মুজামুল বালদান, পৃ: ৫৬) (মুজামুল বালদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬১০)

এর পরের বিষয়টি হলো, নাহাবন্দ-এর যুদ্ধ। এখানে একবিংশ হিজরীতে ইরানীরা ইরাকে আজাম তথা ইরাকের সেই অংশ যেটি পারস্যবাসীদের অধীনস্থ ছিল, সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে নাহাবন্দ নামক জায়গায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে দেড় লক্ষ ইরানী যোদ্ধা পুরোদস্তর একত্রিত হয়। হযরত সা'দ (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে এ বিষয়ে অবগত করলে হযরত উমর (রা.) অভিজ্ঞ পরামর্শকদের পরামর্শক্রমে ইরাকী বংশোদ্ভূত হযরত নু'মান বিন মুকাররিন মুযনী কে মুসলিম যোদ্ধাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হযরত নু'মান তখন কাসকারে অবস্থান করছিলেন। কাসকার নাহরাওয়ান থেকে শুরু করে বসরার নিকটবর্তী দজলা নদীর উৎসস্থলে ডান পাশের এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে বহু গ্রাম ও শহর রয়েছে। মোটকথা, হযরত উমর (রা.) তাকে নাহাবন্দ পৌঁছার নির্দেশ দেন। দেড় লক্ষ ইরানীদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ হাজার। হযরত নু'মান সেনাসারিতে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং বলেন, আমি যদি শাহাদাত বরণ করি তাহলে সেনাদলের প্রধান বা সেনাপতি হবেন হুযায়ফা। আর হুযায়ফাও যদি শাহাদাত বরণ করেন তাহলে অমুক সেনাপতি হবে, আর এভাবে এক এক করে তিনি সাত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন। এরপর দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তোমার ধর্মকে সম্মানিত কর এবং তোমার বান্দাদের সাহায্য কর আর নু'মান-কে আজ সর্বপ্রথম শাহাদাতের মর্যাদা দান কর। অপর এক বর্ণনা অনুসারে তিনি (রা.) এভাবে দোয়া করেন যে, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এ দোয়া করছি যে, আজ তুমি আমার চোখকে এমন বিজয়ের মাধ্যমে প্রশান্ত কর যাতে থাকবে ইসলামের সম্মান আর আমি লাভ করব শাহাদাত। যুদ্ধ আরম্ভ হলে মুসলমানরা এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যে, সূর্যাস্তের পূর্বেই রণক্ষেত্র মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং সেই যুদ্ধেই হযরত নু'মান (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। আবু লুলু ফিরোজ এ যুদ্ধে বন্দি হয় এবং সে দাস হিসেবে হযরত মুগীরা বিন শো'বার অধীনে আসে। এ হলো সেই ব্যক্তি যে পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.)-এর ওপর হামলা করে তাঁকে শহীদ করেছিল। হযরত উমর (রা.) নাহাবন্দের আমীরকে পত্র লিখেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যদি মুসলমানদের বিজয় দান করেন তাহলে খুমস অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ গনিমতের সম্পদ বায়তুল মালে রেখে বাকি পুরোটাই মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করে দিবেন আর এই সেনাবাহিনী যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কোন ভয় নেই, কেননা ভূপৃষ্ঠের চেয়ে এর পেট বা কবর উত্তম।

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে একবার বনু আসাদ গোত্রের লোকেরা হযরত সা'দ (রা.)-এর নামায পড়ানো নিয়ে আপত্তি করে এবং তারা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে অভিযোগ করে যে, তিনি (রা.) সঠিক পদ্ধতিতে নামায পড়ান না। হযরত উমর (রা.) এটি তদন্তের জন্য হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে প্রেরণ করেন। কিন্তু তদন্তে জানা যায় যে, অভিযোগটি ভুল ছিল। যাহোক, কতিপয় কারণবশত হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে মদিনায় ডেকে পাঠান।

(রওশন সিতারে, রচনা- গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৮-৯০) (আল মুজামুল বালদান, পৃ: ২৯২) (শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩৯)

এর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে, তা হলো, হযরত জাবের বিন সামরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, কূফাবাসীরা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট হযরত সা'দ (রা.)-এর নামে অভিযোগ করলে তিনি তাকে অপসারণ করেন এবং হযরত আম্মার (রা.)-কে আমেল তথা গভর্ণর নিযুক্ত করেন। কূফাবাসীরা হযরত সা'দ (রা.)-এর নামে দাখিলকৃত অভিযোগে এটিও বলেছিল যে, তিনি ভালোভাবে নামায পড়াতেন না। হযরত উমর (রা.) তাকে ডেকে বলেন, হে আবু ইসহাক! (আবু ইসহাক হযরত সা'দের ডাকনাম ছিল) মানুষ বলে, আপনি নাকি ঠিকমতো নামাযও পড়ান না। উত্তরে আবু ইসহাক (রা.) বলেন, খোদার কসম! আমি তাদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর শেখানো নামায পড়াতাম আর এতে বিন্দুমাত্র কম বেশি করতাম না। এশার নামাযের প্রথম দুই রাকাত দীর্ঘ এবং পরবর্তী দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত করতাম। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আবু ইসহাক! আপনার বিষয়ে আমার এমনটিই ধারণা ছিল, অর্থাৎ আমার বিশ্বাস ছিল– আপনি এরূপই করেন।

এরপর হযরত উমর (রা.) এক বা একাধিক মানুষকে তার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য তার সাথে কূফায় প্রেরণ করেন। তারা হযরত সা'দ (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জন্য প্রতিটি মসজিদে যান এবং কোনটি বাদ দেন নি আর সর্বত্র মানুষ তার অর্থাৎ হযরত সাদ (রা.)-এর প্রশংসা করে। সবশেষে তারা বনূ আবাস গোত্রের মসজিদে যান। তাদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যান, যাকে উসামা বিন কাতাদা বলা হতো এবং তার ডাকনাম ছিল আবু সা'দা। সে বলে, তুমি যেহেতু আমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়েছ তাই সত্য বলছি, প্রকৃত বিষয় হলো, সা'দ সেনাবাহিনীর সাথে যেত না, গনিমতের সম্পদ সমভাবে বণ্টন করত না এবং ন্যায়-মীমাংসা করত না। সে ব্যক্তি হযরত সা'দ (রা.)-এর উপর এই অভিযোগগুলো আরোপ করে। তখন অর্থাৎ একথা শুনে হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর দরবারে তিনটি দোয়া করছি। হে আমার আল্লাহ্! তোমার এই বান্দা অর্থাৎ অভিযোগ উত্থাপনকারী যদি মিথ্যাবাদী হয় আর লোকদেখানো ও সস্তা খ্যাতির উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তুমি তাকে দীর্ঘজীবি কোরো, তার দারিদ্রতা বৃদ্ধি কোরো এবং তাকে সমস্যায় জর্জরিত কোরো। এরপর যারাই তার অর্থাৎ সেই অপবাদ আরোপকারীর অবস্থা জানতে চাইত প্রত্যুত্তরে সে বলত, আমার বয়স হয়ে গেছে, বৃদ্ধ হয়ে গেছি, অবস্থা শোচনীয় এবং নানান সমস্যায় জর্জরিত আর আমার উপর হযরত সা'দ (রা.)-এর অভিশাপ লেগেছে অর্থাৎ আমি যে অপবাদ আরোপ করেছিলাম তার শাস্তি ভোগ করছি। আব্দুল মুলক বলতেন,এরপর আমি তাকে এরূপ অবস্থায় দেখেছি যে, বার্ধক্যের কারণে তার ভ্রুগুলো দু'চোখের ওপর এসে পেড়েছিল কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তা সত্ত্বেও তার চারিত্রিক অবস্থা এরূপ ছিল যে, সে রাস্তায় মেয়েদেরকে বিরক্ত করত, চোখ টিপত। বুখারীতে এসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৭৫৫)

যাহোক, এসব অভিযোগ শুনে হযরত সা'দ খুব কষ্ট পান। তিনি বলেন, আরবদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র পথে তির নিক্ষেপ করেছে। আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে যখন যুদ্ধের জন্য বের হতাম তখন আমাদের কাছে গাছের পাতা ব্যতীত খাওয়ার কিছুই থাকত না। আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমাদের প্রত্যেকের মল উট বা ছাগলের শুকনো বিষ্ঠার ন্যায় হতো। পরিতাপ, আজ বনু আসাদ বিন খুযায়মা আমাকে ইসলামের নিয়ম-

যুগ খলীফার বাণী

আজ প্রত্যেক আহমদীর কাজ হল পৃথিবীবাসীকে অবগত করা যে ধর্ম কি? আমাদের অধিকার সমূহ কি এবং আমাদের দায়িত্বাবলী কি?

(মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২০১৯ সাল, জার্মানী)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

নীতি শেখায়! (এসব কথা যদি সত্য হয়) তবে তো আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং আমার সব কর্ম বিফলে গেল। বনু আসাদের লোকেরা হযরত উমরের কাছে গীবত করেছিল এবং বলেছিল, সে ভালোভাবে নামায পড়ে না। এটিও বুখারীর বর্ণনা।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৭২৮)

২৩ হিজরী সনে যখন হযরত উমরের ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয় তখন হযরত উমরের কাছে লোকজন নিবেদন করে যে, আপনি খিলাফতের জন্য কাউকে মনোনীত করুন। তখন হযরত উমর (রা.) খিলাফত নির্বাচনের জন্য একটি বোর্ড গঠন করেন যাতে হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম ও হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ (রা.) প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উমর বলেন, এদের মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচিত করবে কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে জান্নাতবাসী আখ্যা দিয়েছেন। এরপর বলেন, যদি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস খিলাফত লাভ করেন তাহলে তিনিই খলীফা হবেন। নতুবা তোমাদের মধ্যে যে-ই খলীফা হন তিনি যেন সা'দের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন, কেননা আমি তাকে এজন্য পদচ্যুত করিনি যে, তিনি কোন কাজ করতে অপারগ ছিলেন, আর এজন্যও নয় যে, তিনি কোন অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৭০০) (সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, বাব মা জাআ ফি কাবরি.... হাদীস-১৩৯২)

যখন হযরত উসমান (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন তখন তিনি হযরত সা'দকে পুনরায় কূফার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি তিন বছর এ দায়িত্বে বহাল থাকেন। এরপর কোন কারণে হযরত সা'দের হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদের সাথে বিরোধ হয়- যিনি তখন বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। যার কারণে হযরত উসমান তাকে পদচ্যুত করেন। হযরত সা'দ পদচ্যুত হবার পর মদিনায় নিভৃতে জীবনযাপন আরম্ভ করেন। যখন হযরত উসমানের বিরুদ্ধে নৈরাজ্য শুরু হয় তখনও তিনি নির্জনে থাকেন।

(সীরুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২০)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, ফিতনার যুগে একবার হযরত সা'দের পুত্র হযরত সা'দকে প্রশ্ন করেন, আপনাকে কিসে জিহাদ করা থেকে বিরত রেখেছে? তখন হযরত সা'দ উত্তরে বলেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করব না যতক্ষণ না আমাকে এমন তরবারি এনে দাও যা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে সনাক্ত করতে পারে। এখন তো মুসলমানরা পরস্পর লড়াই করছে। অপর একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ বলেছেন, এমন তরবারি আন যার চোখ, ঠোঁট ও জিহ্বা আছে, যে আমাকে বলবে যে,অমুক ব্যক্তি বিশ্বাসী আর অমুক ব্যক্তি অবিশ্বাসী।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৬)

এখন পর্যন্ত তো আমি কেবল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছি।

সুনানে তিরমিযির একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ হযরত উসমানের যুগে উদ্ভব হওয়া নৈরাজ্য সম্পর্কে বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয় ভবিষ্যতে একটি ফিতনার উদ্ভব হবে। তখন বসে থাকা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে আর দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে এবং চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে। অর্থাৎ কোনভাবেই ও কোনক্রমেই এ ফিতনার অংশ হবে না বরং আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে। তখন কেউ জিজ্ঞেস করেছিল যে, যদি নৈরাজ্য আমার ঘরে প্রবেশ করে তখন আমি কি করবো? যদি নৈরাজ্য আমার ঘরে প্রবেশ করে তাহলে আমি কী করব। তিনি বলেন, তাহলে তুমি আদম সন্তানের ন্যায় হয়ে যেও।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল ফিতন, হাদীস-২১৯৪)

অর্থাৎ যেমনটি পবিত্র কুরআনে ইবনে আদম এর উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ আত্মরক্ষা অবশ্যই কর, কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্যে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করবে না আর পবিত্র কুরআনে এ ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে এটিই বুঝা যায় যে, সম্ভবত এই উদাহরণই তিনি দিয়েছিলেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন নৈরাজ্যের সূচনা হয় তখন এই নৈরাজ্যকে দূরীভূত করার ক্ষেত্রে সাহাবীদের চমৎকার ভূমিকার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

'যদিও সাহাবীদেরকে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো না কিন্তু তারপরও তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তারা তাদের কাজ দুটি অংশে ভাগ করেন। যারা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন এবং যাদের চরিত্রের প্রভাব সাধারণের মাঝে বেশি তারা তাদের সময় লোকদেরকে বুঝানোর জন্য ব্যয় করতেন আর যারা তেমন কোন প্রভাব রাখতেন না অথবা যুবক ছিলেন তারা হযরত উসমান (রা.)-এর সুরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। পুনরায় তিনি লিখেন, প্রথমোক্ত জামা'তের মাঝে হযরত আলী এবং পারস্য বিজেতা হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস নৈরাজ্য দূর করার কাজে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন।

(ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাত কা আগায, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২১)

হযরত উসমান (রা.)-এর পর হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকালেও হযরত সা'দ নিভৃতেই ছিলেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী যখন হযরত আলী এবং আমীর মুয়াবিয়ার মাঝে মতবিরোধ বৃদ্ধি পায় তখন আমীর মুয়াবিয়া তিনজন সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে তার সহযোগিতার জন্য চিঠি লিখেন এবং তাদেরকে লিখেন যে, তারা যেন হযরত আলীর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করে। এতে তারা তিনজনই অস্বীকৃতি জানান। হযরত সা'দ আমীর মুয়াবিয়াকে এই পঙক্তিগুলো লিখে পাঠান,

মুয়াবিয়াতু দাউকা আদ্-দাউল আয়া'

ওয়া লায়সা লিমা তাজীউ বিহি দাওয়া'

আ ইয়াদউনী আবু হাসানিন আলীয়্যুন

ফালাম আরদুদ আলাইহে মা ইয়াশা'

ওয়া কুলতু লাহু আ'ত্বিনী সাইফান বাসীরান

তামিয়ু বিহিল আদাওয়াতু ওয়াল ওলা'

আ তাতমাউ ফিল্লাযী আ'ইয়া আলিয়্যান

আলা মা কাদ তামে'তা বিহিল আফা'

লেইয়াওমিম মিনহু খায়রুম মিনকা হাইয়ান

ওয়া মায়তান আনতা লিলমারয়ে ফিদাউহু

এর অনুবাদ হলো, হে মুয়াবিয়া! তুমি কঠিন রোগে ভুগছ, তোমার রোগের কোন ঔষধ নেই, তুমি কি এতটাও বুঝ না যে, আবু হাসান অর্থাৎ হযরত আলী আমাকে যুদ্ধ করার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু আমি তার কথাও মানিনি আর আমি তাকে বলেছি যে, আমাকে শত্রু ও বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য বলে দিতে পারে এমন তরবারি দান করুন। হে মুয়াবিয়া! তুমি কি আশা রাখ, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করার জন্য হযরত আলীর কথা রাখেনি সে তোমার কথা মেনে নিবে। অথচ হযরত আলীর জীবনের একটি দিন তোমার সারা জীবন ও মৃত্যুর চেয়েও উত্তম, আর তুমি এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাকে ডাকছ! উসদুল গাবাহ্-তে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৫)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার আমীর মুয়াবিয়া হযরত সা'দকে জিজ্ঞেস করেন, আবু তুরাবকে (আবু তুরাব হযরত আলীর ডাকনাম ছিল) মন্দ বলতে আপনাকে কোন জিনিস বারণ করে? তিনি তাকে মন্দ বলতেন না। হযরত সা'দ বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার সম্পর্কে যে তিনটি কথা বলেছিলেন, সেগুলোর কোন একটিও যদি আমার সম্পর্কে হতো, তবে তা আমার জন্য লাল উটের চেয়েও অধিক প্রিয় হতো। তিনটি কথার কারণে আমি কখনো তাকে অর্থাৎ হযরত আলীকে মন্দ বলব না। প্রথমত একবার রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলীকে একটি যুদ্ধের সময় তাঁর (সা.) পিছনে রেখে যান। এতে হযরত আলী তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের মাঝে রেখে যাচ্ছেন? তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তুমি কি এতে আনন্দিত নও যে, আমার সাথে তোমার ঠিক সেরকমই সম্পর্ক, যেমনটি মূসার সাথে হারূনের সম্পর্ক ছিল; পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, আমার অবর্তমানে তুমি নবুয়্যতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নও। দ্বিতীয়ত খায়বারের যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার বলেন, আমি এমন ব্যক্তির হাতে ইসলামের পতাকা দেব, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা রাখে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালোবাসেন। এটি শুনে আমরা এর আকাঙ্ক্ষা করতে থাকি; প্রত্যেকের মাঝেই এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, পতাকা

যেন আমি পাই, আমিও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসি! অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, আলীকে ডাক। তিনি আমাদের মধ্য থেকে কাউকেই তা দেন নি, বরং বলেন, আলীকে ডাক। হযরত আলী আসেন, তাঁর চোখে যন্ত্রণা হচ্ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর চোখে নিজের মুখের পবিত্র লালা লাগিয়ে দেন এবং ইসলামের পতাকা তার হাতে তুলে দেন, অতঃপর আল্লাহ্তা'লা সেদিন মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। তৃতীয় যে বিষয়টি তিনি বর্ণনা করেন তা হলো, যখন আয়াত فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ (সূরা আলে ইমরান: ৬২) যার অনুবাদ হলো তুমি বলে দাও– আস, আমরা আমাদের পুত্রদের ডাকি এবং তোমরা তোমাদের পুত্রদের ডাক, আমরা আমাদের নারীদের ডাকি এবং তোমরা তোমাদের নারীদের ডাক– অবতীর্ণ হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনকে ডাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্! এরা হলো আমার পরিবার-পরিজন। এটি তিরমিযির রেওয়ায়েত।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭২৪)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের পুত্র মুসআব বিন সা'দ বর্ণনা করেন, যখন আমার পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন তার মাথা আমার কোলে ছিল। আমার চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে। তিনি আমাকে দেখে বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনার বিয়োগ ব্যাথা আর এ বেদনা যে, আপনার মৃত্যুর পর আপনার অনুরূপ কাউকে দেখছি না। এই দুঃখে কাঁদছি। তখন হযরত সা'দ বলেন, আমার জন্য কেঁদো না, আল্লাহ্ আমাকে কখনো শাস্তি দেবেন না, আর আমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। কিছু লোক আপত্তি করে বসে যে, অমুক ব্যক্তি অমুক অনুষ্ঠানে বলেছে যে, অমুক জান্নাতী, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয় কীভাবে? এখানে হযরত সা'দও বলছেন যে, আমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর বলেন, আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে তাদের সেসব পুণ্যের প্রতিদান দিন যা তারা আল্লাহ্র জন্য করেন। আর কাফেরদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে তা হলো– আল্লাহ্ তাদের ভালো কাজের কারণে তাদের শাস্তি লাঘব করে দেন; কিন্তু যখন সেসব ভালো কাজ ফুরিয়ে যায়, তখন পুনরায় তাদের শাস্তি দেন। প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজের কর্মের প্রতিদান তাঁর কাছে চাওয়া, যাঁর জন্য সে সেই কর্ম করেছে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৮-১০৯)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর পুত্র বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করি, আমি লক্ষ্য করেছি আপনি আনসারদের সাথে সে ব্যবহার করেন যা অন্যদের সাথে করেন না। তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি আনসাদের সাথে যে ব্যবহার করি তোমার মনে কি সে বিষয়ে কোন আপত্তি আছে? উত্তরে আমি বললাম, না; কিন্তু আপনার এই ব্যবহার দেখে আমি আশ্চর্য হই। হযরত সা'দ বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি, মু'মিনরাই তাদেরকে ভালোবাসে এবং মুনাফিকরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। সুতরাং, এ কারণেই আমি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করি।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৬)

জারীর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, একবার তিনি হযরত উমর (রা.)-এর কাছে যান। তিনি হযরত উমর (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত উমর (রা.) তাঁকে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমি তাঁকে (রা.) এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি (রা.) তার রাষ্ট্রের সবচেয়ে ভদ্র মানুষ ও সবচেয়ে কম কঠোর। তিনি (রা.) তো তাদের জন্য মমতাময়ী মা তুল্য। পিপীলিকা যেভাবে সঞ্চয় করে তিনিও তাদের জন্য সেভাবে সঞ্চয় করেন। রণক্ষেত্রে তিনি সবার চেয়ে সাহসী, বীর এবং কুরাইশদের মাঝে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৪)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ৫৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার (রা.) বয়স সত্তরের অধিক ছিল। মতান্তরে তার বয়স ছিল ৭৪ আবার কারো কারো মতে তার বয়স ছিল ৮৩।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১০) (আল ইসতিয়াব, ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬১০)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর মৃত্যুর সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে তার (রা.) মৃত্যুর সন ৫১ হিজরী থেকে নিয়ে ৫৮ হিজরী পর্যন্ত পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনাকারী তার মৃত্যুর সন ৫৫ হিজরী উল্লেখ করেছেন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৬)

মৃত্যুকালে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে তিনি (রা.) আড়াই লক্ষ দিরহাম রেখে যান।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১০)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) মদিনা থেকে সাত মাইল, মতান্তরে দশ মাইল দূরবর্তী এলাকা আক্বীক্ব নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। সেখান থেকে মানুষ কাঁধে করে তার শবদেহ মদিনায় নিয়ে আসে এবং মসজিদে নববীতে তার (রা.) জানাযা আদায় করা হয়। মদিনার তৎকালীন শাসক মারওয়ান বিন হাকাম তার জানাযা পড়ান। তার জানাযায় মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনীরাও অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হয়েছেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১০) (উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৬) (আল ইসতিয়াব, ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬১০)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর জানাযা সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর মৃত্যুর সময় মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীরা এই বার্তা পাঠান যে, মানুষ যেন তার জানাযা মসজিদে নিয়ে আসে যাতে তারাও জানাযার নামায পড়তে পারেন। তারাএমনটিই করে। জানাযা পড়ার জন্যতার মরদেহ তাদের ঘরের সামনে রাখা হয়েছিল। এরপর তার মরদেহ বসার স্থানসংলগ্ন বাবুল জানায়েয থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনীগণের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যে, মানুষ এটা নিয়ে সমালোচনা করছে আর বলছে যে, মরদেহ [মহানবী (সা.)-এর সময়] মসজিদে আনা হতো না। হযরত আয়েশা (রা.)-এর কানে এ কথা পৌঁছলে তিনি বলেন, মানুষ কত দ্রুত এমন বিষয় নিয়ে সমালোচনা আরম্ভ করে যা তারা জানেই না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, জানাযা মসজিদে প্রবেশ করানো হয়েছে বলে লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করে। অথচ মহানবী (সা.) মসজিদের ভিতরেই হযরত সুহায়েল বিন বায়যা (রা.)-এর জানাযার নামায পড়েছিলেন। এটি মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, বাবুস সালাত আলা জানায়েয ফিল মসজিদে, ৯৭৩) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৯)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) মৃত্যুশয্যায় ওসীয়্যত করেন যে, আমার জন্য লেহেদ খনন কোরো আর মহানবী (সা.)-এর জন্য কবরে যেমন ইট লাগানো হয়েছিল আমার জন্যও তেমনটি কোরো। এটি মুসলিম শরীফের বর্ণনা।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয ফিল লাহদে, হাদীস-৯৬৬)

মুহাজির পুরুষদের মাঝে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) সবার শেষে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস মৃত্যুর সময় একটি উলের জুব্বা বের করে ওসীয়্যত করেন যে,আমার কাফন হিসেবে এটি ব্যবহার কোরো, কেননা আমি এই জুব্বা পরিধান করে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি এটিকে এই সময়ের জন্য অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৬)

হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেন,

"হযরত উমর (রা.)-এর যুগে যখন সাহাবীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয় তখন বদরী সাহাবীদের সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য বিশেষ ভাতা

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

নির্ধারণ করা হয়। স্বয়ং বদরী সাহাবীরাও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ গর্ব বোধ করতেন। যেমন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মিওর সাহেবও লিখেন যে, ইসলামী সমাজে বদরী সাহাবীদের সর্বমহান সদস্য মনে করা হতো। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস যখন ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুপথযাত্রী ছিলেন তখন তিনি বলেন, আমার জন্য সেই জুব্বা নিয়ে আস যা আমি বদরের যুদ্ধের দিন পরিধান করেছিলাম এবং যা আজকের দিনের জন্য আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি। সা'দ (রা.) সেই ব্যক্তি যিনি বদরের যুদ্ধের সময় যুবক ছিলেন। পরবর্তীতে তার হাতে ইরান বিজিত হয়। তিনি কূফার প্রতিষ্ঠাতা এবং ইরাকের গভর্ণর ছিলেন। কিন্তু তার দৃষ্টিতে এই সমস্ত সম্মান ও গৌরব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সম্মান ও গৌরবের মোকাবিলায় মূল্যহীন ছিল। তিনি নিজের জন্য বদরের যুদ্ধের পোশাককে সমস্ত পোশাক থেকে সবচেয়ে পবিত্র পোশাক বলে মনে করতেন। তার শেষ ইচ্ছা ছিল, এই পোশাকে আবৃত করে তাকে যেন কবরে নামানো হয়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৭৩)

তিনি সা'দ নামের একটি প্রাসাদ বানিয়েছিলেন। এই মহল নির্মাণে যদি কারো মনে কোন প্রশ্ন জাগে তাহলে এর উত্তর হলো, তিনি শেষ বয়সে নির্জনবাস অবলম্বন করেছিলেন আর যে জিনিস তিনি পছন্দ করেছেন তা হলো, বদরের যুদ্ধে পরিধান করা কাপড়। এছাড়াও পূর্বে বর্ণিত তার নিভৃত জীবনযাপনই তার বিনয় ও সরলতার প্রমাণ।

হযরত সা'দ বলেন, আমি যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি তখন আমার কেবল মাত্র একটি কন্যা সন্তান ছিল। অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে,বিদায় হজ্জের সময়ও তার একটিই কন্যা সন্তান ছিল। এরপর আল্লাহ্‌তা'লা তার প্রতি এত কৃপা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমার সন্তানসন্ততির সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তিনি বিভিন্ন সময়ে মোট নয়টি বিয়ে করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের ঘরেতাকে চৌত্রিশটি সন্তান দিয়েছেন যাদের মাঝে সতেরোজন ছেলে এবং মেয়ে ছিল সতেরো জন।

(রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৮-৯৯) (আল আসাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৯)

হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের স্মৃতিচারণ এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতে পরবর্তী সাহাবীর স্মৃতিচারণ শুরু করব ইনশাআল্লাহ্‌।

আজ আমি নামাযের পর কয়েক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াব। প্রথম জানাযা হলো জনাব সাফদার আলী গুজ্জর সাহেবের, যিনি ফযল মসজিদে যিয়াফত বিভাগে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি গত ২৫শে জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।(মৃত্যুর পূর্বে) কয়েক দিন তিনি হাসপাতালেও ছিলেন। ৭৯ বছর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী করেছিলেন। তিনি ত্রিশ বছর পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের যিয়াফত বিভাগে সেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর মেহমান, জামা'তের কর্মচারী এবং অন্যান্য সদস্যদেরও অসাধারণ সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন। এছাড়াও মরহুম দীর্ঘ দিন আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকা এবং আহমদীয়া পত্রিকার প্যাকেজিং ও পোস্টিংয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার অভিবাসন মামলা দীর্ঘ দিন ঝুলে থাকে আর দীর্ঘকাল পরতা গৃহীত হয় এবং তার পরিবারের যুক্তরাজ্যে আসার ব্যবস্থা হয়। তখন তিনি আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আর কখনো অভিযোগ করেননি যে, এতদিন তাকে একাকী জীবন কাটাতে হয়েছে। এমর্মে তিনি কখনো কোন অভিযোগ করেননি। খিলাফতের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন এবং খিলাফতের দ্বারেই পড়ে থাকতেন। তিনি খিলাফতের জন্য এতটাই নিবেদিত ছিলেন যে, আমি বলব, তিনি অন্যদের জন্য এক দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি জামা'তের সদস্য এবং রক্তসম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ সম্মানজনক সম্পর্ক রাখতেন।দোয়ায় অভ্যস্ত, নিয়মিত নামাযী, উত্তম সেবক, সর্বজনপ্রিয় এবং খুবই কোমল প্রকৃতির অধিকারী মানুষ ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবী ভাষার কবিও ছিলেন আর তার সুমধুর কণ্ঠের জন্য তিনি জামা'তের সদস্যদের মাঝে জনপ্রিয় ছিলেন। জলসা সালানার সময় সাধারণের মাঝে নযম পড়ার কারণে মরহুমকে অনেক পছন্দ করা হতো। মরহুম লাহোরের প্রসিদ্ধ জামা'ত হান্ডু গুজ্জর-এর সদস্য ছিলেন। তিনি তার স্ত্রী ছাড়া ৪ পুত্র ও ২ কন্যা স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে গেছেন।

জনাব আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব লিখেন, সফদর আলী সাহেব অত্যন্ত সরল প্রকৃতির একজন মানুষ ছিলেন। এছাড়াও তিনিছিলেন জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান ও নিঃস্বার্থ এবং অক্লান্ত কর্মী। তিনি বলেন, তার তিনটি অসাধারণ গুণ ছিল যা আমার হৃদয়ে তার জন্য ভালোবাসা বৃদ্ধি করেছে। প্রথমত তিনি আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ ছিলেন। সীমিত জীবনোপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি কথায় কথায় আল্লাহ্‌ তা'লার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। দ্বিতীয়ত তার হৃদয়ে যুগখলীফা ও খিলাফতের প্রতিসীমাহীন ভালোবাসা ছিল। তিনি বলেন, সাক্ষাৎ সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে তিনি খিলাফতের সাথে আন্তরিক সম্পর্কের কথা বলেন নি, এমনটি আমার মনে পড়ে না। তৃতীয়ত তিনি ধর্মের সেবা আন্তরিক ভালোবাসার সাথে করতেন আর এটিকে তিনি সৌভাগ্য বলে মনে করতেন।

তার কন্যা তাহসিন সাহেবা লিখেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি অন্যদের সুখ দিয়েছেন। তার কোন পরিচিত মানুষ কিংবা মসজিদে কাউকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলে বাড়িতে এসে তিনি নাম উল্লেখ করে আমাদের সবাইকে দোয়া করতে বলতেন। সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌ তালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। অন্যদের উপকার করে তাদের প্রতিই এই বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন যে, আপনি আমাকে পুণ্যকর্ম করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, তিনি বলতেন, তোমরা দুই বোন এ কারণেও আমার খুব প্রিয় যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কন্যাদের সম্মান করবে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। পুনরায় তিনি বলেন, আমাদেরকে তিনি পরম স্নেহ-মমতার পাশাপাশি অনেক সম্মান ও মর্যাদাও দিয়েছেন। দ্বিতীয় কন্যা রাযিয়া সাহেবা লিখেন, আমাদের পিতা সর্বদা আমাদেরকে খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখার নসীহত করতেন। তিনি নিজেও খিলাফতের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি লিখেন, তার মৃত্যুতে সহমর্মিতা জানানোর জন্য যারাই এসেছেন, তাদের প্রত্যেকেই বলেছেন, আমাদের মনে হতো তিনি আমাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আসলে প্রত্যেকের সাথেই তার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমাদের ধারণা ছিল তিনি হয়ত মসজিদের আশেপাশের লোকজনের সাথেই সুসম্পর্ক রাখতেন, কিন্তু (তার মৃত্যুর পর) সকলেই বলছিল, তিনি যেন আমাদের পরিবারেরই একজন সদস্য ছিলেন। দূর দূরান্তের লোকদের কাজ করে দিতেন আর তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন।তার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সেবা প্রদানের ফলেই এমনটি অর্থাৎ লোকজন এভাবে তার সম্পর্কে নিজেদের আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করেছে। মানুষ আমার কাছেওতার সম্পর্কে অনেক চিঠি লিখেছে আর প্রতিটি পত্র থেকেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেকের সাথেই তার ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক ছিল। খুব কম মানুষই এমন হয়ে থাকেনযিনি সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে সর্বজনপ্রিয় এবং সকল শ্রেণির মানুষের সাথে তারসুসম্পর্ক থাকে। একইভাবে প্রত্যেক পত্র লেখকই লিখেছেন, তার প্রতিটি কথাবার্তার কেন্দ্র হতো খিলাফত এবংএর সাথে সম্পর্ক স্থাপন। আল্লাহ্‌তা'লা তাকে নিজ প্রিয়দের মাঝে স্থান দিন এবং তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্যকর্ম ও দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। তার সহধর্মিণীকে তিনিস্বাস্থ্য দিন এবং ধৈর্য ও মানসিক প্রশান্তি দান করুন। তার সহধর্মিণীও দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন। নিজের শত ব্যস্ততা ও কাজ থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে তিনি তার সেবা করেছেন। অতিথিশালায় তিনি কাজ করেছেন আরতার মাঝে একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর চেয়েও অধিক সেবা করার স্পৃহা ছিল। কিন্তু পাশাপাশি তিনি পারিবারিক দায়িত্বাবলীও সঠিকভাবে পালন করতেন। অনুরূপভাবে ভাষা না জানা সত্ত্বেও ইংরেজ প্রতিবেশীদের সেবা করতেন এবং তাদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। আর তারাও তার অনেক প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা শ্রদ্ধেয়া ইফ্‌ফাত নাসির সাহেবার। তিনি জনাব প্রফেসর নাসির আহমদ খান সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন।তিনি গত ০৩ মে তারিখে ৯০ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। ১৯৫১ সনে মরহুম প্রফেসর ডাক্তার নাসির আহমদ খান সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তিনি তার পেছনে এক কন্যা আয়েশা নাসির সাহেবাকে রেখে গেছেন। তিনি আমেরিকা প্রবাসী ডাক্তার এনায়েতুল্লাহ্‌ মাঙ্গলা সাহেবের স্ত্রী। পুত্রদের মাঝে রয়েছেন জহির আহমদ খান এবং ডাক্তার মুনির আহমদ খান সাহেব। তার উভয় পুত্রের বিয়ে হয়েছে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর বংশে। তার এক পৌত্র নাসীর আহমদ খান সাহেব ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী আর এখন এমটিএ-এর সম্প্রচার বিভাগে

সুচারুরূপে নিজ দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এখানে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পর ওয়াক্‌ফ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও তার দোয়ার ভাগীদার করুন।

তার পুত্র লিখেন, ছেলেবেলায় আমি আমার আম্মার সাথেই ঘুমাতাম আর অধিকাংশ রাতেই ঘুম ভেঙে গেলে তাহাজ্জুদ নামাযে তাকে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে দেখতাম। একই কথা তার কন্যাও লিখেছেন। তিনি নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর আমরা যারা শিশু ছিলাম তাদের জন্যও সকালে কুরআন তিলাওয়াত করে স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল, এছাড়া যাওয়ার অনুমিত ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে ষাটের দশকে তিনি লাহোরে বসবাস করতেন। সেখানেমডেল টাউনে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভগ্য পেয়েছেন। ২৮ বছর পর্যন্ত তিনি পশ্চিম দারুন্ নসর হালকার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তখন সুযোগ সুবিধাও অনেক কম ছিল এবং পাড়াটি ছিল বিস্তৃত, কোন বাহন ছিল না। দারুন্ নসর পড়াটি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আর সেই দীর্ঘপথ তিনি পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন জামা'তের সদস্যদেরকে তাদের সকল অ-আহমদী আত্মীয়স্বজন এবং দুর্বল আহমদীদের নিকট পত্র প্রেরণের আহ্বান জানান তখন তিনিও এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার আত্মীয়স্বজনের নিকট অসংখ্য পত্র লিখেন।

দরিদ্র আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের তিনি কোন না কোন সুযোগে অনেক সাহায্য করতেন। বিশেষ করে রমজান মাসে তিনি অবশ্যইকিছু না কিছু রান্না করেপাঠিয়ে দিতেন। সর্বদা মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি করেবিভেদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। তার মেয়ে আয়েশা সাহেবা লিখেন, তিনি একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর সাথে নিতান্ত হাস্যবদনে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আমাদের শিক্ষাদীক্ষাকে তিনি তারপ্রধান দায়িত্ব জ্ঞান করতেন আর একই সাথে অনেক বেশি দোয়াও করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও মাগফিরাত করুন এবং তার সন্তানসন্ততি ও বংশধরদের তার সদিচ্ছগুলো পূর্ণকারী ও তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

পরবর্তী জানাযা হলোজনাব আব্দুর রহীম সাকী সাহেবের। তিনি যুক্তরাজ্য জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী অফিসের একজন কর্মী ছিলেন। গত ৩১ মার্চ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ? ???????? ? ? ?? ????? ?????? ? ??? ? ?????। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তিনি ১৯৩৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ভারতের নাভা রাজ্যের অন্তর্গত রায়পুর মৌজায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম ছিল রহমত আলী সাহেব। তার মরহুম পিতার বড় চাচা গ্রামপ্রধান চৌধুরী করীম বখ্‌শ সাহেবের মাধ্যমে তার বংশে আহমদীয়াতের আগমন ঘটে। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। মরহুম আব্দুর রহীম সাকী সাহেবের পিতার খালাতো ও চাচাতো বোন এবং মৌলভী কুদরতউল্লাহ্ সানৌরি সাহেবের স্ত্রী মহিলা সাহাবী রহীমন বিবি সাহেবা সম্পর্কে তার ফুফু ছিলেন। মরহুম সাকী সাহেব ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত দশ বছর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তাখ্‌ত হাজারার সেক্রেটারী মাল এবং কায়েদ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। দেশ বিভাগের পর তিনি তাখ্‌ত হাজারায় এসে বসবাস শুরু করেন। এরপর ১৯৬৮ সালে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তাখ্‌ত হাজারার আমীর নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৪ সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি উক্ত জামা'তের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৭৪ সালের ১৩ জুলাই তারিখে তাখ্‌ত হাজারা'রঅ-আহমদীদুষ্টচক্র আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দুর্বৃত্ত এবং আহমদী বি রোধীদের সমন্বয়ে অনেক বড় সশস্ত্র দল গঠন করে আহমদীদের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যের সূচনা করে। মসজিদের একটি অংশে আগুন লাগিয়ে তা দখল করে নেয়। অতিথিশালা সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে দেয়। সাকী সাহেবের মুদি দোকান ছিল, সেটি লুট করে তাতেও অগ্নিসংযোগ করে। অনুরূপভাবে তার আরো একটি কাপড়ের দোকান ছিল, সেটিও দখল করে নেয়। বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে। তিনি তখন ভিতরেই ছিলেন আর ধোঁয়ার কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। দুর্বৃত্তরা তাকে অচেতন অবস্থায় উঠিয়ে মসজিদে নিয়ে যায় আর লাউডস্পিকারে ঘোষণা করে যে, আমি অর্থাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর তওবা করেছেন যেন অন্য আহমদীরাও জামা'ত ছেড়ে দেয়। যাহোক তার জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখেন, বল্লম ও বর্শার বেষ্টনির মাঝে তিনি বসে আছেন আরতার মনমস্তিষ্কে এর গভীর প্রভাব পড়ে। অতঃপর এজন্য তার সন্তানরাই তাকে সেখান থেকে লাহোরে তার কোন আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে তার চিকিৎসা হয় এবং তিনি সেখানেই থাকেন। এরপর লাহোরেই একটি জামা'তে, অর্থাৎ যেখানে গিয়ে দ্বিতীয়বার বসবাস আরম্ভ করেন সেখানেই তিনি পুনরায় ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করেন। তার এক আত্মীয়ের বাড়িসংলগ্ন জায়গায় নামায সেন্টার নির্মাণ করেন এবং বাজামা'ত নামাযের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি শত শত শিশু এবং বড়দের পবিত্র কুরআন পড়িয়েছেন।

অতঃপর ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে হিজরত করে লন্ডনে চলে আসেন। এখানে এসে ২০২০ সন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী অফিসে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে রীতিমত সেবা করতে থাকেন। তিনি ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীদের চেয়েও অধিক সময়নিষ্ঠ ছিলেন। সবার আগে অফিসে আসতেন যেন কাউকে অপেক্ষা করতে না হয়। বরং কখনো কখনো অফিসে আসার পূর্বে নাস্তা বানাতে দেরি হলে নাস্তা না করেই চলে আসতেন। তার আরেকটি গুণ হলো, তার সন্তানরা লিখেছে যে, প্রত্যহ তিনি পবিত্র কুরআনের ৩ পারা তিলাওয়াত করতেন। খিলাফতের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসা পোষণ করতেন। শিশু ও বড়দেরকে সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার এবং যুগ খলীফার সম্মান ও পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আনুগত্য করার প্রতি পূর্ণ সহমর্মিতার সাথে নসীহত করতেন। ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী, বিশেষত মুরব্বীদের আন্তরিকভাবে সম্মান করতেন এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী এক ব্যক্তি ছিলেন। প্রায় ৬০ বছরের অধিক সময় তিনি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ধর্মসেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তার ছেলে খালেদ মাহমুদ সাহেব কলিয়ার্স উড জামা'তের প্রেসিডেন্টও বটে। মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া দুই পুত্র এবং পাঁচ কন্যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততি এবং বংশধরদেরও তার পুণ্য বাসনাগুলো পূর্ণ করার তৌফীক দান করুন।

পরবর্তী জানাযা যেটি পড়াব সেটি হলো সাঈদ আহমদ সেগাল সাহেবের জানাযা। তিনি আমাদের পিএস দপ্তরে ডাক প্রেরণ বিভাগে স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন। গত ১২ এপ্রিল তারিখে ৯০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে ২ পুত্র এবং ২ কন্যা রেখে গেছেন। মরহুমের শৈশব কাটে কাদিয়ানে আর প্রথমিক শিক্ষাও তিনি সেখানেই অর্জন করেন। দীর্ঘকাল যাবৎএখানে প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরের ডাকপ্রেরণ বিভাগে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত এবং জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। জাগতিক জ্ঞানের পাশাপাশি পবিত্র কুরআন এবং জামা'তী মাসলা মাসায়েল সংক্রান্ত গভীর জ্ঞান রাখতেন। নামাযে নিয়মিত এবং খিলাফতের প্রেমিক ছিলেন। খুবই বিনয়ী এবং ভদ্রতার এক উত্তম দৃষ্টান্ত ছিলেন। বন্ধুমহলে খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমিও দেখেছি, যখনই সাক্ষাৎ করতেন পরম বিনয় ও বেদনার সাথে ইচ্ছা ব্যক্ত করতেন যেন তার সন্তানরাও একইভাবে জামা'তের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে। আসলাম খালেদ সাহেব লিখেন, তিনি বিশেষ জ্ঞানপিপাসু প্রকৃতি রাখতেন। প্রায়শই দুপুরের খাবারের সময় বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা করতেন। বিশেষত খ্রিষ্টধর্ম ও ইহুদি ধর্মমতের গভীর জ্ঞান ছিল তার। আমাদের দপ্তরের কর্মী বশীর সাহেব লিখেন, শেষ বয়সেও তিনি জামা'তের সেবা করার পূর্ণ চেষ্টা করতেন। তিনি বলেন, একবার কোন কাজে মসজিদে আসার সময় মাথা ঘুরে নীচে পড়ে যান এবং আঘাতও পান, কিন্তু তা সত্ত্বেও (বেশ দূর থেকে পায়ে হেঁটে আসতে হতো) দপ্তরে অবশ্যই আসতেন যেন সেবা করার সুযোগ হাতছাড়া না হয়। নিজের বড় বাড়ি বিক্রি করে মসজিদের কাছে ফ্ল্যাট কিনে নিয়েছিলেন যেন যাতায়াতের সুবিধা হয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফিরাত ও কৃপা করুন এবং তার সন্তানদের পক্ষে তার দোয়া সমূহ কবুল করুন। (আমীন)

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তওবার অর্থ হল মানুষ পাপকে এমন স্বীকারুক্তি সহকারে ত্যাগ করবে যে এরপর যদি তাকে আগুনেও নিক্ষেপ করা হয়, তবুও কোনমতেই সে পাপ করবে না। (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ১৯০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

রসুলের বাণী

অন্তরে খোদার পরিচিতি, মুখে খোদার স্বীকারুক্তি এবং তাঁর আদেশাবলী মেনে চলার নামই হল ঈমান। (ইবনে মাজা, বা ফিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

২পাতার পর.....

দাঁড়ায়,ইসলাম যে ন্যায়পরায়ণতার কথা বলে,এর মানদন্ড কী? পবিত্র কুরআনের ৪নম্বর সূরার ১৩৬ নম্বর আয়াতে বলাহয়েছে, কাউকে যদি তার নিজের বিরুদ্ধে বা তার পিতামাতার বিরুদ্ধে বা তার সবচেয়ে প্রিয় কারও বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয়, ন্যায়-নীতি এবংসত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য তার একাজ করা উচিত। নিজেদের অধিকারের নামে শক্তিশালী ও উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে দরিদ্র ওদুর্বল দেশগুলোর প্রাপ্য অধিকার খর্ব করা উচিত নয়, আর দরিদ্র জাতিগুলোর প্রতি অন্যায় আচরণ করা থেকেও তাদের বিরত থাকা উচিত। পক্ষান্তরে,দরিদ্র ও দুর্বল জাতিগুলোর উচিত, তারা যেন শক্তিশালী বা উন্নত জাতিগুলোর ক্ষতিসাধনের সুযোগ সন্ধান না করে। বরং, উভয় পক্ষেরই ন্যায়-নিষ্ঠার নীতিমালা মেনে চলার চেষ্টা করাউচিত। সত্যিকার অর্থে, এটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তি-সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আরেকটি শর্তের কথা পবিত্র কুরআনের ১৫ নম্বর সূরার ৮৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, কোনপক্ষই যেন অপরের সম্পদ ও বিত্তের প্রতি ঈর্ষার বা লোভাতুর দৃষ্টিতে না তাকায়। একইভাবে, এক দেশের পক্ষ থেকে আরেক দেশকে সহায়তা বা সমর্থন দানের মিথ্যা অজুহাতে তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস বা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে, অন্যের দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্রসমূহকে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের নামে তাদেরকে ভারসাম্যহীন ব্যবসায়িক লেনদেন বা চুক্তিতে বাধ্য করা উচিত নয়। একইভাবে, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির বা সহায়তা প্রদানের নামে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্পত্তি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার ফন্দি আঁটা উচিত নয়। নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ কিভাবে যথাযথ ব্যবহার করতে হয় তা স্বল্পশিক্ষিত সমাজ বা সরকারকে শেখানো উচিত। জাতি এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো,সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীকে সেবা ও সাহায্য প্রদান করা। তবে এই ধরনের সেবা জাতীয় বা রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যেন না হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গত ছয় বা সাত দশক ধরে জাতিসংঘ দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী বা প্রতিষ্ঠান গড়েতুলেছে। এই প্রচেষ্টায় তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ঘাটন করেছে। এত সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন দরিদ্র দেশই উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে উপনীত হতে পারে নি। এর অন্যতম একটি কারণ হলো, এসব দরিদ্র দেশের শাসকদের ব্যাপক দুর্নীতি। যদিও দুঃখের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে,উন্নত দেশগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থে এরপরও এসব সরকারের সাথে লেনদেন অব্যাহত রেখেছে। এদের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন, আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং ব্যবসায়িক চুক্তির ধারা অব্যাহত থেকেছে। এর ফলে, সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর মাঝে হতাশা এবং অস্থিরতা ব্যপকভাবে বেড়েছে যা এসব দেশে বিদ্রোহ ও আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র জনগণ এত বেশী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা কেবল নিজেদের নেতাদের বিরুদ্ধেই ক্ষুব্ধ নয় বরং পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধেও তারা ভীষণ চটে আছে। এমতাবস্থায়, চরমপন্থী দলগুলোর হাত শক্তিশালী হচ্ছে– যারা এই হতাশার সুযোগ নিয়ে এসব হতাশাগ্রস্ত লোককে তাদের দলে ভিড়াতে চেষ্টা করছে এবং তাদের ঘৃণা-সর্বস্ব মতবাদের পক্ষে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হচ্ছে। এর চূড়ান্ত পরিণতিতে বিশ্ব শান্তি ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইসলাম আমাদের মনোযোগ শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়-উপকরণের প্রতি আকর্ষণ করে। এজন্য চাই অকৃত্রিম ন্যায়পরায়ণতা। এর জন্য সবসময় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা অপরিহার্য। আমরা যেন অন্য কারও সম্পদের প্রতি লোভের দৃষ্টিতে না তাকাই– এটি হলো এর দাবী। উন্নত দেশগুলো তাদের স্বার্থসিদ্ধির চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে নিঃস্বার্থ সেবার চেতনা ও প্রেরণা নিয়ে অনুন্নত ও দরিদ্র জাতিসমূহের সাহায্য ও সেবা করবে, এটিই এর দাবী। এসব দিক যদি মেনে চলা হয় কেবল তবেই সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

স্মরণ রাখবেন, অন্যায় ও অবিচার বিরাজমান থাকলে কখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। অতএব কোন দেশ যদি সকল ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে এবং অন্য আরেক দেশকে আমণ করে ও অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ করায়ত্ত করতে চায়, তাহলে এই নিষ্ঠুরতা থামানোর জন্য অন্য দেশগুলোর অবশ্যই পদক্ষেপ নেয়া উচিত। কিন্তু এ কাজে তাদেরকে সর্বদা ন্যায়-নীতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামী শিক্ষানুসারে যে সব পরিস্থিতিতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তা সবিস্তারে কুরআনের ৪৯ নম্বর সূরার ১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত আছে। পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়, যখন দু'টি জাতি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয় আর বিবাদ যুদ্ধে পর্যবসিত হয়, তখন অন্যান্য সরকারের উচিত তাদেরকে সংলাপ এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আলোচনার প্রতি জোরালোভাবে আহ্বান জানানো, যেন তারা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিষ্পত্তি করে একটি সন্ধি বা মীমাংসায় উপনীত হতে পারে। তবে যদি কোন এক পক্ষ চুক্তির শর্ত মেনে না নেয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ করে, তাহলে আগ্রাসীকে থামানোর জন্য অন্য দেশগুলোর সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করা উচিত। আগ্রাসী জাতি যখন পরাজিত হয় এবং সে পারস্পরিক আলোচনায় বসতে সম্মত হয়, তখন সকল পক্ষের এমন একটি মিমাংসায় উপনীত হবার জন্য কাজ করা উচিত যা দীর্ঘমেয়াদী শান্তি এবং মিমাংসার পথ সুগম করবে। কোন জাতিকে শেকলাবদ্ধ করার জন্য তার বিরুদ্ধে কঠোর ও অন্যায় কোন শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। কেননা এর দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল হলো অস্থিরতা, যা আরো বীভৎস রূপধারণ করবে এবং বিস্তৃত হবে। পরিণামে ছড়িয়ে পড়বে আরও নৈরাজ্য।

তৃতীয় কোন সরকার যদি বিবদমান দুইপক্ষের মাঝে মিমাংসার চেষ্টা করে,তার উচিত পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করা। আর এই নিরপেক্ষতা তখনও বিদ্যমান থাকতে হবে যখন কোন এক পক্ষ এর বিরূদ্ধাচরণ করে। এমন পরিস্থিতিতেও তৃতীয় পক্ষের কোন প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করা উচিত নয় বা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে অথবা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কোন কাজ করা উচিত নয়। সকল পক্ষকে তাদের যথাযথ অধিকার প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। শান্তি প্রক্রিয়ায় যেসব দেশন্যায়বিচারের দাবী পূরণের লক্ষ্যেমধ্যস্থতা করে, তাদের উচিত নিজেদেরস্বার্থ চরিতার্থ করা বা অন্যায়ভাবে উভয় দেশের কাছ থেকে অন্যায্য সুযোগসুবিধা আদায় বা এ লক্ষ্যে অন্যায়ভাবে চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা। অন্যায় হস্তক্ষেপ বা কোন পক্ষের উপর অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়। কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার সুযোগ নেয়া উচিত নয়। দেশগুলোর বিরুদ্ধে অনাবশ্যক এবং অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত নয়। কেননা এটি একদিকে সঠিকও নয় আবার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়নে এটি সহায়ক ভূমিকাও পালন করে না।

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমি এ বিষয়গুলো অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। এক কথায়, আমরা যদি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বৃহত্তর স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থকে ত্যাগ করতে হবে এবং এর পরিবর্তে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত গড়তে হবে বিশুদ্ধ ন্যায়পরায়ণতার উপর। অন্যথায়, আপনারা অনেকেই এ বিষয়ে একমত হবেন, অদূর ভবিষ্যতে নতুন নতুন জোট ও ব্লক তৈরি হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এভাবে বলা উচিৎ, এ প্রয়িা ইতোমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে যার ফলশ্রুতিতে নৈরাজ্য বৃদ্ধি পেতে পেতে এক পর্যায়ে এটি এক বিপুল ধ্বংসযজ্ঞের রূপ লাভ করতে পারে। এরকম ধ্বংসযজ্ঞ ও যুদ্ধের কুফল নিশ্চিতভাবে প্রজন্ম-পরম্পরায় প্রকাশিত হতে থাকবে। তাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত, প্রকৃত ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। সে সব মহৎ লক্ষ্যে কাজ করা উচিত যা আমি ইতোমধ্যে বর্ণনা করে এসেছি। এমনটি করলে জগদ্বাসী সবসময় আপনাদের এই মহান প্রচেষ্টাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। আমি দোয়া করি, আমার এই আশা যেন বাস্তব রূপ লাভকরে (আমীন)। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ

(১ম পাতার পর....)

করেছিল যে আপনি সেখানে এসে নামায পড়ুন এবং দোয়া করুন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এই সত্য জানিয়ে দেন যে এই মসজিদ এই উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে তাদের কপটতা প্রকাশ না পায় আর এরা এখানে একত্রিত হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদেরকে তারা ধ্বংস করে দিতে পারে। এই কারনে রসুল করীম (সা.) এই মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন এবং সেখানে আবর্জনার ফেলার স্থান বানানোর নির্দেশ দেন। তাই মসজিদ কোন অপরাধীকে রক্ষা করতে পারে না। যদি মসজিদে কোন কোনও অসৎ কাজ করা হলে সেটি অসৎ হিসেবে ধরা হবে আর সৎ কর্ম করলে সৎ হিসেবে ধরা হবে। কেবল মসজিদই নয়, পবিত্র কাবা সম্পর্কেও রসুল করীম (সা.) বলেছেন যে , এটি কোনও অপরাধী বা আইন অমান্যকারীকে আশ্রয় দেয় না, আর হত্যা করে পলায়নকারীকেও রক্ষা করতে পারে না। এমন লোকেরা ধৃত হবে এবং আইনে হাতে তাদেরকে তুলে দেওয়া হবে। এই কারণে মক্কা বিজয়ের সময় রসূল করীম (সা.) এর কাছে যখন সংবাদ পৌছল যে ইবনে আখতাল, যাকে তিনি হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন, সে কাবার পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বলেন, তাকে সেখানেই হত্যা কর। কাজেই তাকে হত্যা করা হয়। (সীরাত হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৩) । অতএব কিছু অপরাধীকে তিনি যখন খানা কাবাতেও হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে অন্যান্য মসজিদগুলি খানা কাবার তুলনায় কি মূল্য রাখে যে সেখানে আইন অমান্যকারীরা আশ্রয় নিলে তাদেরককে আইনের উর্দ্ধে ধরতে হবে। সুতরাং জানা বোঝা গেল যে, মসজিদ তৈরী হয়েছে তাকওয়া প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে, আইন অমান্য করার জন্য নয়। যদি মসজিদও আইন অমান্য করার আখড়ায় পরিণত হয়, শয়তানের জন্য তো কোনও গৃহই বন্ধ নয়। যে ঘর খোদা তা'লা শান্তি, হৃদয়ের প্রশান্তি, তাকওয়ার প্রতিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকতা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ঐক্যের জন্য তৈরী করেছেন, সেই ঘরকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আখড়া বা বিবাদ-বিশৃঙ্খলা তৈরীর স্থানে পরিণত করা ভয়ানক অপরাধ, যার অনুমতি ইসলাম কোনওভাবেই দেয় না।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৩, কাদিয়ান থেকে মূদ্রিত)

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

২২শে অক্টোবর, ২০১৯

পার্লামেন্ট সদস্যদের উদ্দেশ্যে হুযুরের ভাষণ

হুযুরের ইংরেজি ভাষণের ভাবার্থ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

সম্মানীয় সকল অতিথিবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু। আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক।

সর্বপ্রথম আমি সকল অতিথিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে আপনারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আজকের এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। বর্তমানে পশ্চিমি বিশ্বে তথা সারা বিশ্বে দেশত্যাগী মানুষ এবং সমাজে তাদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনা মূলত মুসলমানদের নিয়েই আবর্তিত হচ্ছে। কিছু দেশ, এমনকি জনসাধারণও সাংস্কৃতিক সংঘাতের বিষয়ে আশঙ্কিত। তাদের ধারণা, মুসলমানেরা পশ্চিমি সমাজে অঙ্গীভুত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, শুধু তাই নয়, তারা এই সমাজের জন্য বিপদও বটে।

এ বিষয়ে কথা বলার পূর্বে এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া জরুরী যে 'সভ্যতার' প্রকৃত অর্থ কি? এর উত্তরে জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফা বর্ণিত পরিভাষা তুলে ধরব যার সম্পর্কে আমিও পূর্ণরূপে একমত। সেই পরিভাষা অনুসারে সভ্যতার অর্থ কোন সমাজের জাগতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জ্ঞানগত উন্নতি ও সমৃদ্ধিকে বোঝায় যার মাধ্যমে কোনও সভ্যতার উন্নতির প্রতিফলন ঘটে। এছাড়া সামরিক শক্তি বা আইন ব্যবস্থা এবং অন্য কোনও মাধ্যমে শান্তি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত পদক্ষেপও সভ্যতার উন্নতির মান নির্ধারণ করে থাকে।

জাতিসমূহের সভ্যতা ছাড়া তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিও রয়েছে যার মাধ্যমে একটি জাতির মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের আচরণ, কর্মপন্থা এবং প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে। সংস্কৃতি নির্ভর করে একটি জনগোষ্ঠীর নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যের উপর, কেবল জাগতিক উন্নতির উপর নয়।

অতএব, সভ্যতা হল জাগতিক, প্রযুক্তিগত এবং জ্ঞানের বিকাশের নাম, অপরদিকে সংস্কৃতি হল ধর্মীয়, নৈতিক এবং বৌদ্ধিক গঠনের বহিঃপ্রকাশ। সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যেকার এই তারতম্য বোঝা যেতে পারে খৃষ্টধর্মের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস থেকে। সেই যুগে রোমান সাম্রাজ্য ছিল প্রবল শক্তিশালী। এমনকি বর্তমানেও তা বিশ্ব ইতিহাসের মহান সভ্যতাগুলির অন্যতম হিসেবে গণ্য হয়। জাগতিক উন্নতি, নাগরিক সুযোগ সুবিধা এবং প্রশাসনিক দক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে রোমান সাম্রাজ্য অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং বুদ্ধিদীপ্ত বলে স্বীকৃত।

তথাপি এই বাহ্যিক মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব খৃষ্টধর্মের নৈতিক মানের সমকক্ষ ছিল না। কেননা খৃষ্টধর্মের প্রাথমিক যুগে এর নাগরিকরা প্রগতিশীলতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। খৃষ্টবাদ ধর্মীয় নীতির বিষয়ে তাদের পথপ্রদর্শন করত, অন্যদিকে রোমান শাসকরা তাদের জন্য জাগতিক নিয়ম-কানুন তৈরী করত।

এমনিতেই রোমানদের স্থাপত্য ও সমৃদ্ধিতে তাদের সভ্যতা প্রতিফলিত হয়, অন্যদিকে খৃষ্টধর্ম তাদেরকে এক অসাধারণ সংস্কৃতি দ্বারা গৌরাবিন্বিত করেছে। কালের প্রবাহে খৃষ্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধর্মে পরিণত হয়। আর এইভাবে রোমান সভ্যতা খৃষ্টীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে। এই সমন্বয় এবং এর শক্তিশালী প্রভাব সামাজিক রীতিনীতি, কৃষ্টি এবং মূল্যবোধের সেই ভিত্তি স্থাপন করে যা ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়া সত্ত্বেও আজও তা পশ্চিমি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে।

এখন অভিবাসনের বিষয়টির দিকে আসা যাক। পশ্চিমি কিছু দেশের সামাজিক পরিসংখ্যনে ব্যপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে বহু মানুষ দেশান্তরিত হয়ে এখানে পৌঁছেছে। কিন্তু এই সব দেশগুলিতে এসে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে, এটিই প্রকৃত উদ্বেগের কারণ। এইসব পশ্চিমি দেশে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যায় এখানে শরণার্থী হওয়ার কারণে এখানকার মূল নাগরিকরদের আশঙ্কা, তাদের বহু শতাব্দী প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

যেমনটি আমি বলেছি, আমরা সভ্যতাকে জাগতিক উন্নতি বলে মনে করি। পশ্চিমি সভ্যতার বিরোধীতা করা, প্রত্যাখ্যান করা কিম্বা উপেক্ষা করা দূর, উন্নয়নশীল দেশগুলি তো এই সভ্যতাই অবলম্বন করছে। কাজেই পশ্চিমি সভ্যতা বিপন্ন হওয়া দূর, বাস্তবে এর ঠিক উল্টোটি দেখা যাচ্ছে।

যাতায়াত এবং যোগাযোগের আধুনিক ব্যবস্থা পৃথিবীকে এক বিশ্ব পল্লীতে রূপান্তরিত করেছে। টেলিভিশন এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম, বিশেষ করে ইন্টারনেট এখন আর কারো অগোচরে নেই। আর আর্থিকভাবে অনগ্রসর দেশগুলির মানুষেরা উন্নত দেশের মানুষের জীবনযাত্রা দেখতে পারে। পশ্চিমি জীবনযাপনে প্রভাবিত হয়ে তারাও এখন জাগতিক উন্নতির সেই উচ্চতা স্পর্শ করতে উদগ্রীব।

অতএব, মুসলমানদের উপস্থিতিতে পশ্চিমি বা ইউরোপীয় সভ্যতা বিপন্ন হচ্ছে, এমন দাবি নিতান্তই অমূলক। বরং পশ্চিমি সভ্যতা মুসলিম বিশ্বসহ সমগ্র বিশ্বেই প্রভাব বিস্তার করছে। তবে ইসলামের প্রসারে ইউরোপের ধর্মীয় এবং নৈতিক সংস্কৃতি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা বোধগম্য হয়। এখন আমি সে বিষয়ের দিকেই আসছি।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর পশ্চিমে এই প্রবণতা উদ্বেগজনক সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমি দেশগুলিতে হওয়া আদমশুমারির পরিসংখ্যন থেকে প্রমাণিত যে ধর্মপরায়ণ বা খোদার প্রতি ঝোঁক থাকা মানুষের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। আমার মতে ধর্মহীনতা পশ্চিমি সংস্কৃতির জন্য ইসলামের থেকেও বড় বিপদ। পশ্চিমি মূল্যবোধ বহু শতাব্দী প্রাচীন, এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় রীতির উপর, বিশেষ করে খৃষ্টান এবং ইহুদী ঐতিহ্যে সুসজ্জিত। এই ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতি তাদের কারণে বিপন্ন যারা সম্পূর্ণরূপে ধর্মের বিরোধী।

একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে আমার পরামর্শ, আপনারা নিজেদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে ধর্মের প্রতি আকর্ষণের পতন প্রতিহত করতে এবং মানুষকে ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনতে নিজেদের শক্তি ও চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করুন। এই সব ধর্ম বিমুখ মানুষেরা হতে পারে খৃষ্টান কিম্বা ইহুদী বা অন্য কেউ। তাই উন্নতির নামে সেই সকল নৈতিক মান এবং মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করা অনুচিত, যেগুলি শত শত বছর থেকে এই সমাজের অঙ্গ হয়ে আসছে। আমি এও মনে করি যে পশ্চিমি দেশগুলিতে ধর্মের প্রতি মনোযোগের বিরাট পতনই মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে আতঙ্কিত করে তুলেছে। কেননা তারা জানে যে মুসলমানরা সাধারণত নিজেদের ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। এই প্রসঙ্গে আমি স্পষ্ট করতে চাই যে, আপনারা সংবাদ মাধ্যমে যা কিছু পড়ুন বা শুনুন, ইসলাম সম্পর্কে ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। মুসলমান কুরআন করীমকে পরিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবে বিশ্বাস করে এবং কুরআন করীমের প্রতি আমাদের ভালবাসা এবং এর প্রতি আনুগত্যের কারণে আমরা বিশ্বাস করি যে ধর্ম প্রত্যেকের জন্য নিজের অন্তরের বিষয়, ব্যক্তিগত বিষয়।

কুরআন করীমের দ্বিতীয় সূরার ২৫৭ নং আয়াতে স্পষ্ট আদেশ রয়েছে যে ধর্মের বিষয়ে কোনও জোরজবরদস্তি নেই। অতএব, অমুসলিমদের এনিয়ে মোটেই আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয় যে মুসলমানরা জোর করে নিজেদের মতবাদ প্রচার করবে বা তাদের এই মহাদেশে জোর করে নিজেদের মতবাদ চাপিয়ে দিবে। উগ্রবাদের পথ অবলম্বনকারী তথাকথিত মুসলমানদের মুষ্টিমেয় দল কুরআন করীমের শিক্ষার প্রতিনিধি নয়। আমি একাধিক বার একথা বলেছি যে উগ্রবাদীরা মুসলমান হোক বা অমুসলিম, সরকার এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উচিত তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করা।

জামাত আহমদীয়া মুসলেমা হিসেবে আমাদের বিশ্বাস, ইসলাম কোনওভাবেই শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্ম প্রসারের অনুমতি দেয় না। তাই ইসলাম সম্পর্কে ভীত হওয়ার কোন্ কারণটি অবশিষ্ট রইল? তবে কেন কারো মনে এই আশঙ্কা তৈরী হবে যে তাদের সংস্কৃতি ইসলামের হাতে বিপন্ন হচ্ছে?

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে তারতম্য বর্ণনা করার পর এখন আমি ইসলামের কিছু মৌলিক শিক্ষা বর্ণনা করব। ইসলাম এবং ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) সম্পর্কে অনেক গুজব ও ভ্রান্তধারণা ছড়ানো হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে ইসলামের সমস্ত আঙ্গিকগুলিকে মেলে ধরা সম্ভব নয়। তবু আমি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইসলামের কিছু শিক্ষা বর্ণনা করব।

মানবাধিকার সম্পর্কে কুরআন করীমের ৪র্থ সূরার ৩৭ নং আয়াতটি সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং কোনও বস্তুকে তাঁর অংশীদার করো না এবং মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যাবহার কর এবং আত্মীয়স্বজন, এতীম ও

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 17 Sep, 2020 Issue No.38

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশীগণের সহিত এবং সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীগণের সহিত। ”

এই আয়াতে একদিকে আল্লাহ্ তা’লা মুসলমানদের তাঁর ইবাদত করার আদেশ করেছেন। অপরদিকে পিতামাতাকে ভালবাসতে এবং তাদের মনোতুষ্টি করার উপদেশ দিয়েছেন। যে শিক্ষা মুসলমানদেরকে পিতামাতাকে ভালবাসার এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার দাবি করে, তার সঙ্গে অন্য কোনও ধর্ম বা জাতির সংঘাত কিভাবে হতে পারে? এই আয়াত মুসলমানদের থেকে আত্মীয়স্বজনের প্রতি ভালবাসা ও মায়া-মমতাপূর্ণ আচরণের দাবি করে। অনাথ এবং সমাজের অন্যান্য অভাবী শ্রেণীর মানুষদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পৌঁছানোর দাবিও করে।

এই বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস, অভাবপীড়িতদের সাহায্য করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল শিক্ষা। যদি সঙ্কটাপন্ন পরিবার বা সমাজের অভাবপীড়িত মানুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, তবে তারা সংকটের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এমনটি করলে যুবক শ্রেণী সুযোগ লাভ করবে এবং তারা নৈরাশা ও বিষাদের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে সমাজের সক্রিয় এবং কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হবে। এই কারণেই জামাত আহমদীয়া মুসলেমা শিক্ষাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং নিজেদের সীমিত প্রাচুর্যের মধ্য থেকে আমরা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে স্কুলও পরিচালনা করছি এবং এমন সব ছাত্রদের জন্য ভাতা চালু করেছি যারা উচ্চ শিক্ষা অর্জনের শক্তি রাখে না।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, সামর্থবান দেশগুলির উচিত পৃথিবীর নির্ধন দেশগুলিকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে তাদের সাহায্য করা। যদি গরীব দেশগুলি নিজেদের অর্থনীতি এবং অবকাঠামো নির্মাণ করে নিতে পারে, তবে সেখানকার নাগরিকরা নিজেদের দেশেই সুযোগ পাবে আর তাদেরকে দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজনও কম অনুভুত হবে। যদি তাদের নিজেদের দেশই দৃঢ় ও স্থিতিশীল থেকে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই তাদের নিজেদের অঞ্চলের পাশাপাশি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের জন্যও তা উপযোগী হবে।

কুরআন করীমের উপরোক্ত আয়াতে প্রতিবেশীর অধিকার প্রদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম। প্রতিবেশীর সীমাও অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের পয়গম্বার বলেছেন, খোদা তা’লা প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তাঁর ধারণা হয়েছে, হয়তো উত্তরাধিকার সম্পদ থেকেও তাদের অংশ দিতে হবে।

ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) এই শিক্ষাও প্রদান করেছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে আল্লাহ্ তা’লার প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পারে না। কি অসাধারণ নীতিই না বর্ণিত হয়েছে। অতএব খোদা তা’লার ইবাদতের পাশাপাশি মানবাধিকার প্রদান করাও আবশ্যক।

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করছি, এমন শিক্ষা পশ্চিমি সভ্যতার জন্য কিভাবে বিপদ হতে পারে? তাই আমার মতে পশ্চিমের দেশবাসীর একথা বলা নিরর্থক হবে যে ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য পৃথিবীর এই অংশে কোনও স্থান নেই।

যদি মুসলমারা এই সমাজের অংশ হওয়ার, প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের এবং দেশ ও জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করার সংকল্প নিয়ে এখানে এসে থাকেন, তবে তা নিন্দাযোগ্য নয়, বরং প্রশংসা যোগ্য।

কিছু মানুষের ধারণা, মুসলমানদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই তারা পশ্চিমি দেশগুলিতে এসে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ করবে আর ইসলামী সভ্যতাকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করবে। এই ধারণার মূলে রয়েছে জিহাদের শিক্ষা এবং ইসলামী ইতিহাসের প্রারম্ভিক যুগে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে ভীষণ রকমের ভ্রান্ত বিশ্বাস। বস্তুত ইসলাম কোন রক্তপিপাসু বা উগ্রবাদী ধর্ম নয়।

একবার আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবী ইসলামী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করে। ইসলামের পয়গম্বার তাঁর আবেদন এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেন যে তার পিতামাত বয়োবৃদ্ধ ছিল। তাই তিনি তাকে বাড়িতে থেকে তাদের সেবা করার আদেশ দিলেন, এবং বললেন, তার জন্য এটিই জিহাদ হবে। জিহাদের উদ্দেশ্য যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রক্তক্ষয়ই হত তবে ইসলামের পয়গম্বার তার এই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে নিয়ে মুসলিম সেনাদলের শক্তিবৃদ্ধিকে প্রাধান্য দিতেন।

একথাও স্পষ্ট হওয়া জরুরী যে, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সেগুলির উদ্দেশ্য শক্তিলাভ করা, অত্যাচার করা বা স্থানীয় মানুষদেরকে ইসলাম স্বীকারে বাধ্য করা ছিল না। এই সব যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে রক্ষা করা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা।

কুরআন করীমের ২২ নং সূরার ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যদি ধর্মান্ধ উগ্রতাবাদীদের কে প্রতিহত না করা হত,তবে কোন সীনাগগ, উপাসনাগার, মন্দির, মসজিদ এবং অন্যান্য উপাসনাগার ভীষণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ত। মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্য এটিই ছিল যে ধর্মকে যেন পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে ফেলা হয়। এটিই প্রমাণ যে ইসলাম অপরাপর সমস্ত ধর্মের নিরপত্তার নিশ্চয়তা দেয়।

এরপর সন্তানদের প্রতিপালন সম্পর্কে কুরআন করীমের ৬ষ্ঠ সূরার ১৫২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে মুসলমান যেন তার সন্তানকে হত্যা না করে। এখানে সন্তানকে স্নেহ করার ও ভালবাসার আদেশও দেওয়া হয়েছে আর রয়েছে তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থার আদেশ, যাতে তারা বড় হয়ে যোগ্য ও নীতিবান মানুষ হিসেবে দেশ ও জাতির সম্পদ হয়।

অনুরূপভাবে ইসলাম মুসলমানদের এই আদেশ দিয়েছে যে তারা যেন সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষের অধিকারসমূহ রক্ষা করে। যেমন, কুরআন করীমের চতুর্থ সূরা ৭ম আয়াতে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন এতীমদের শোষন বন্ধ করে এবং তারা সাবালক হয়ে স্বনির্ভর হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্মান এবং উত্তরাধিকার রক্ষা করে।

পশ্চিমি বিশ্বে ইসলামের উপর আরও একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে যে, মুসলমান মহিলাদেরকে এবং তাদের অধিকারসমূহকে যথাযোগ্য মূল্য দেয় না। প্রথম স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, সর্বপ্রথম ইসলামই মহিলাদের উত্তরাধিকার, ‘খোলা’ নেওয়া এবং আরও বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের জন্য ইসলাম সমান শিক্ষা এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতি ও সমৃদ্ধির সুযোগ তৈরীর জন্য অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ইসলামের পয়গম্বারের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে, যেটি হল , ‘মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে।’ এই বাক্য থেকে সমাজে মহিলাদের মহান ভূমিকা এবং স্পষ্ট ও অতুলনীয় মর্যাদা বোঝা যায়। মায়েদের কাছেই এমন শক্তি ও যোগ্যতা আছে, যার দ্বারা তারা নিজেদের সন্তানদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাতের দরজা খুলে দিতে পারে।

অনুরূপভাবে কুরআন করীমের চতুর্থ সূরার ২০ নং আয়াতে মুসলমান পুরুষদের আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের স্ত্রীদেরকে ভালবাসে, তাদেরকে সম্মান করে। পশ্চিমি বিশ্বের দেশগুলিতে এমন কোনও দিন অতিবাহিত হয় না যাতে গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনায় পুলিশ এবং আদালতের হস্তক্ষেপের সংবাদ প্রকাশিত হয় না। একাধিক গবেষণা এবং সমীক্ষা থেকে, যেমন ব্রিটেনের জাতীয় পরিসংখ্যন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ২০১৮সালের একটি প্রতিবেদন থেকে প্রমাণিত যে, এমন অপরাধ কোনও এক বিশেষ ধর্মের মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। সাম্প্রতিক আরও একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, জার্মানীও এমন ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। অতএব ইসলমাকে মহিলা বিরোধী ধর্ম বলে আখ্যায়িত করা অত্যন্ত অন্যায়।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir